অতিপ্রাকৃত উপন্যাসিকা

কালো জাদু

মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর

সবা প্রকাশনা

বাবার আমলের পাকিস্তানি সিনেমার নায়িকা জেবা আলির নাক। সুচিত্রার কপাল, কপোল আর চিবুক। রাখি গুলজারের ঠোঁট। মধুবালার দাঁত। কাঁধের ওপর ছড়ানো স্ট্রেট কালো রেশমী ক্লিওপেট্রা চুল।

এক

অনেক চেষ্টা করেও অমল কান্তি ইন্সুরেন্স কোম্পানির চাকরিটা বাঁচাতে পারল না। পরপর তিন মাস হলো টার্গেট পূরণ করতে পারেনি। তার বেতন আসে গ্রাহকদের প্রিমিয়াম থেকে। তিন মাসে গ্রাহক জোগাড় করতে পেরেছে মাত্র পাঁচজন। সেই পাঁচজনও এমন কোনও বড় পার্টি না, নিজের পরিচিতদের মধ্য থেকেই ধরে বেঁধে রাজি করিয়েছিল। এরা প্রথম দু'মাস প্রিমিয়াম জমা দিয়েছে, তৃতীয় মাসে প্রিমিয়ামের খবর নেই। দেখা করতে গেলে কাজের মহিলা দরজা খুলে বলে, 'সাহেব, মেম সাহেব কেউ "বাসাত" নাই।'

ওদিকে ড্রয়িং রুমে হিন্দি সিরিয়াল চলছে, ডাইনিং টেবিলে জগ থেকে গ্লাসে জল ঢালার গবগব শব্দ। অমল কান্তির ভাই-বোন, বিধবা মা পাটুরিয়ায় গ্রামের বাড়িতে থাকে। আগে জমি-জমা ভালই ছিল। এখন পদ্মা ভেঙেচুরে সব শেষ করেছে, সেই সঙ্গে ওপারে পাড়ি জমিয়েছে অমলের বাবাও। সংসার চালানোর দায়িত্ব এখন তার কাঁধে। অফিস থেকে বেরিয়ে পীর ইয়ামেনী মাজারের কাছে ছোট পার্কে বসে গুলিস্তানের ট্র্যাফিক জ্যাম দেখতে দেখতে এখন কী করবে সেটি ভেবে কাহিল হয়ে যাচ্ছে অমল। ছোটাছুটি, হৈচৈ, কনুইয়ের গুঁতো, জামাই-বউ চানাচুর, আ-য়ে বুট-পালিশ, বাবা ভিক্ষা দেন—কত তাল! কে কার আগে যাবে, কীভাবে দু'টাকা পকেটে আসবে, সেই প্রচেষ্টা। অথচ সে কী করবে সেটাই ভেবে পাচ্ছে না। অমল লক্ষ করল, বেশ কিছুক্ষণ হয় চেংড়া এক ছেলে আশপাশে ঘুরঘুর করছে। এর কাজ কানের ময়লা পরিষ্কার করা, মাথা বানানো। ছোট্ট একটা কাঠের বাক্সে নানান উপকরণ। খাওয়া-পরার জন্যে মানুষ কত কী যে করে! লোকে চুল-দাড়ি কাটার বেলায় যত রেগুলার, কান পরিষ্কার করার বেলায় ততটা বোধ হয় না। চুল-দাড়ি বাইরে থেকে দেখা যায়। কানের ভেতর কী ছুঁচোর নেত্য হচ্ছে, বাইরে

থেকে তো আর সেটা দেখা যায় না। পরিষ্কার করালেই কী, আর না করালেই কী? ময়লার ঠেলায় কান চুলকানো শুরু হলে তবেই না। ছেলেটার জন্যে অমলের মায়া হচ্ছে। এর হয়তো সকাল থেকে খদ্দেরই জোটেনি। এদের খদ্দেরদের যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, তাতে ছ'মাসে ন'মাসে একবারই হয়তো কান পরিষ্কার করাতে পারে। দুপুরে কী খাবে সেটা ভেবে হয়তো ভেতরে ভেতরে অস্থির কান পরিষ্কার করাঅলা। ছেলেটাকে ডেকে পাশে বসাল অমল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'কামাল।'

'বাড়ি কোথায় তোমার?'

'এত কথার কাম কী? কান পরিষ্কার করাইবেন, না মাথা বানাইবেন?'

'মাথা বানাতে কত লাগবে?'

'আদা গণ্টা দশ টাকা।'

'আচ্ছা বানাও, মাথা বানাও। তবে ওই সব তেলফেল দিয়ো না। শুকনো-শুকনো মাথা বানাও। হাই অ্যাণ্ড ড্রাই।'

কামাল মাথা বানাতে শুরু করার পর অমল আবার জিজ্ঞেস করল, 'কামাল, তোমার বাড়ি কোথায় তা তো বললে না।'

'আমার বাড়ি কই জাইন্যা কী করবেন, সাব?'

'কিছুই করব না। তবুও জানতে চাই। বলতে না চাইলে বাদ দাও।'

'আমার বাড়ি লালমণির হাট।'

কামাল এখন চুল টানা বাদ দিয়ে দুই হাতের পাঞ্জা একসঙ্গে করে মাথায় হালকা বাড়ি দিচ্ছে। জোড়া জোড়া আঙুলের চটর-পটর শব্দ। ঘুমের আমেজ। দুশ্চিন্তার অবসান। কিন্তু ঘুমানো যাবে না। ঘড়ি, মানিব্যাগ লোপাট হতে পারে।

'আচ্ছা, কামাল, লালমণির হাটের নাম লালমণির হাট হলো কেন?'

'এইটা তো, সা'ব, কইতে পারতাম না। তই এক সা'বে মনে লয় পারব।'

'কোন্ সাহেব পারবে?'

'মাজে মদ্যে এক সা'ব চাইরটার দিকে এই পার্কে আহে। হেই সা'ব খুব শিক্ষিত।'

'সেই সাহেব খুব শিক্ষিত তা তুমি বুঝলে কী করে? তোমাকে কি সে বলেছে?'

'এমনিই বুজা যায়। আফনে দেকলেও বুজবেন।'

'সেই সাহেব এসে কী করে? তোমাকে দিয়ে মাথা বানায়?'

'জী, আমি তার মাথা বানায়া দেই।'

'এত শিক্ষিত লোক পার্কে বসে মাথা বানাবে কেন? সে মাথা বানাবে এসি সেলুনে। না হয় মাসাজ পার্লারে।'

'হেইডা তো, সা'ব, কইতে পারতাম না। আমি উনারে কোনও দিন জিগাই নাই।'

'জিজ্ঞেস করনি কেন?'

'ওস্তাদের নিষেধ আছে। বড় কাস্টমাররে কোনও কিছু জিগাইতে নাই।'

'সে বড় কাস্টমার হলো কীভাবে?'

'সা'বে একবার মাথা বানাইলে এক শ' টাকা দেয়।'

'এক শ' টাকা দেয় পার্কে বসে মাথা বানানোর জন্যে! আজব লোক তো রে, ভাই। আজকে আসবে নাকি?'

'হেইডা তো, সা'ব, কওন যায় না। আইতেও পারে, আবার না-ও আইতে পারে।'

'কতদিন ধরে এখানে আসছে সে?'

'তা ধরেন এক মাস হইব।'

'এই এক মাসে ক'বার এসেছে ওই লোক?'

'ছয়-সাতবারের মত।'

'যদি সাতবার হয়, তা হলে সে এসেছে প্রতি চার দিনে একবার। শেষবার কবে এসেছিল?'

'দুই দিন আগে।'

'রুটিনমাফিক এলে আরও দু'দিন পরে আসার কথা, ঠিক না?'

'জী, ঠিক। তয় আইজ মনে লয় আয়া পড়ব। ঘড়িত এখন বাজে কয়টা?'

'সাড়ে তিন।'

'আদা গণ্টা বহেন। আইলে লুকটারে দেকতে পারবেন।'

বসা ছাড়া অমল কান্তির আর কাজ কী? কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই।

শ'খানেক চিনে বাদাম কিনে বেঞ্চে বসে অমল আর কামাল বাদাম খেল। বাদাম খেয়ে গলা গেল শুকিয়ে। জলের জগ আর গ্লাস নিয়ে ঘোরাঘুরি করা জলঅলাকে খুঁজতে গেল কামাল। অমলের পাশে বেঞ্চের ওপর তার কাঠের বাক্স। এই বাক্স কামালের ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট। সে যে-পেশার লোক, তার পরিচয় বহন করে ওটা। যেমন ধুনকারের ধুনুরি, নাপিতের ক্ষুর-কেঁচি-আয়না, ডাক্তারের কালো চামড়ার ব্যাগ, ছুরি-চাকু ধারদেয়াঅলার শান দেয়া মেশিন, শিল-পাটা-কোটাঅলাদের ছেনি-হাতুড়ি, উকিলের-মুহুরির ডায়েরি। এইসব 'দক্ষ' পেশাজীবীদের সবাই পুরুষ। মেয়েদের ভেতর কেবল বেদেনীরাই ঝোলার ভেতর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ঘোরাঘুরি করে। মফস্বল শহরে বেদেনীদের রমরমা ব্যবসার জায়গা হলো কোর্ট প্রাঙ্গণে বটগাছের তলা। পিঠ বের করা ছোট-ছোট ঘটি হাতা ব্লাউজ, ছাপা শাড়ির নিচ দিয়ে সেমিজের কুচি বেরিয়ে আছে, পাড়ে ঢাকা ভারী নিতম্ব, গোলাপি স্যান্ডেল, পায়ের বর্তুলাকার আঙুলে হালকা দেবে যাওয়া নিখুঁত কাটা নখে গাঢ় লাল নেলপালিশ, চুড়ো করে খোঁপা বাঁধা চুল, পানের রসে লাল ঠোঁট, গোল গোল মসৃণ হাত ভর্তি চুড়ি, রোদে পোড়া লালচে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য। কোর্টে যারা আসে, তাদের সিংহভাগ গ্রামের খেটে খাওয়া মাঝবয়সী মানুষ। বছর-বছর ছেলেমেয়ে হওয়াতে এদের বউরা কাহিল। বেদেনীদের আঁটসাঁট দেহ, চিরল দাঁতের হাসি, ঘাম আর চুলের সুগন্ধ এক বড় ধরনের ডাইভারশান। মেয়েগুলোর কাছাকাছি বসে নানান অসুখ-বিসুখের আলোচনা করলে এদের মনটা অন্তত হালকা হয়। সে বেদেনীর ওষুধে অসুখ ভাল হোক, আর না হোক। কোর্ট এক ভয়াবহ নিষ্ঠুর জায়গা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মায়াকাড়া ব্যবহার এখানে নেই। তবে বেদেনীদের আছে। বেদেনীরা যখন কথা বলে, তখন তাদের সামনে বসা মাঝবয়সী লোকগুলো এমনভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন খ্রিস্টের বাণী শুনছে। আসলে আদৌ কিছু শুনছে কি না সেটাই প্রশ্ন।

বেদেনী নিজেও সেটা ভালভাবেই জানে। তার অভিজ্ঞতাও কম নয়। কথা দিয়ে আর নানান ঢঙ-ঢাঙ করে এসব লোকেদের মুগ্ধ করাই তার কাজ। তার সাফল্য যতখানি ওষুধে, তার থেকে ঢের বেশি কথায়। কোর্টের উকিল, মুহুরি, পেশকার, বেইলিফদের টাকা দেয়ার পর বাস-ভাড়া, দুপুরে খাওয়ার টাকা মাইনাস করে যা থাকে, তার বেশ খানিকটা যায় বেদেনীদের হাতে। অডেসি-র সাইরেনরাও মেয়ে ছিল। তবে পুরো মেয়ে নয়। উপরের অর্ধেক মেয়ে, নিচের অর্ধেক পাখি। সাইরেনদের গলা ছিল সাবিনা ইয়াসমিনের থেকেও বেশি মিষ্টি। একবার এদের গলার গান শুনলে ভুল হয়ে যেত দুনিয়াদারি। সাইরেনদের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে থাকত পুরুষেরা। তারপর যেত ওদের পেটে। বেদেনীরা সাইরেন নয়। তাদের মায়া-দয়া আছে। টাকা-পয়সা হয়তো কিছু নেয়, তবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আর চোখ-মুখ নেড়ে মন তো রাঙায়। মেয়েদের সঙ্গ যে কত মধুর হতে পারে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই বেদেনীরা। নিজেদের স্বামীদের সঙ্গে বেদেনীরা এরকম মিষ্টি ব্যবহার করে কি না, কে জানে? তবে নিজ গৃহে খাণ্ডারনী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

হঠাৎ অমল কান্তির চোখে পড়ল সিটি কর্পোরেশনের অফিসের ওদিকটায় সাদা এক গাড়ি থেকে লম্বা একহারা গড়নের মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক নামছে। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, পায়ে কালো চামড়ার ফিতেঅলা স্যাণ্ডেল। চোখে কালো সানগ্লাস। সোজা অমল কান্তির সামনে এসে থামল লোকটা। বোঝাই যাচ্ছে দূর থেকেই কামালের 'টুল-বক্স' দেখতে পেয়েছে। ওই বাক্সই বেঞ্চটার কাছে টেনে এনেছে তাকে। অমল দেখল ঘসঘসে কালো চুল লোকটার। সম্ভবত কলপ দেয়া। তবে মুখ আর হাত দেখে থমকে যেতে হয়। দেখলে মনে হয় রক্ত নেই শরীরে। টান-টান হয়ে আছে ফর্সা চামড়া। হয়তো পুড়ে গিয়েছিল লোকটার শরীর। অন্য জায়গা থেকে চামড়া কেটে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে মুখে আর হাতে। ক্ষয়ে গেছে নাকের পাটা, ঠোঁটের কোনা। আঙুলে নখ নেই বললেই চলে। অমলের বুঝতে দেরি হলো না

এই লোকই কামালের ভিআইপি কাস্টমার। মুখ খুলল অমল, 'আপনি কি কামালকে খুঁজছেন?'

'কামাল না জামাল সেটা বলতে পারব না। তবে এই বাক্স যার, তাকেই খুঁজছি,' খসখসে গলায় উত্তর দিল সফেদ আগন্তুক।

'এই বাক্স কামালের। জল আনতে গেছে। বসেন, এসে পড়বে এখনি।'

বেঞ্চে বসে লোকটা বলল, 'আপনি কি কামালের আত্মীয়?'

'জী-না। আমি ওর কাস্টমার। সত্যি বলতে কী আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন! ইন্টারেস্টিং। কী ব্যাপার বলেন তো?'

'না তেমন কিছু না। মাথা বানাচ্ছিলাম ওকে দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম বাড়ি কোথায়। ও বলল লালমণির হাট। জানতে চেয়েছিলাম লালমণির হাটের নাম লালমণির হাট হলো কেন।'

'ও, আচ্ছা। তো এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?'

'আছে, সম্পর্ক আছে। কামাল বলছিল, ও জানে না, তবে আপনি জানেন।'

'জানলেই বা কী? সে তো আমাকে চেনে না। এখানে কখন আসব তারও কোনও ঠিক নেই। আপনাকে বলল আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর জানি, আর আপনি কাজ-কাম ফেলে পার্কে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এ তো দেখি "আমার মন বলে তুমি আসবে..." তাজ্জব ব্যাপার!'

'আপনি যেরকম ভাবছেন বিষয়টা সেরকম নয় মোটেও। আমি এমনিতেই সময় কাটানোর জন্যে বেশ কিছুক্ষণ বসতাম এখানে। এরই ভেতর আপনি এসে পড়লেন। একে কাকতালীয় ছাড়া আর কী বলব?'

জল নিয়ে কামাল এসে পৌঁছাল। ভিআইপি কাস্টমারকে বেঞ্চের ওপর বসে থাকতে দেখে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল তার। বলল, 'ছার, কহন আইলেন?'

'এই তো এখনই। তুমি তো মনে হচ্ছে ব্যস্ত?'

'কী যে বলেন, ছার? আফনের কাম সবতের আগে। মাথা বানাইবেন, ছার?'

'না। আজ আর মাথা বানাতে হবে না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম পার্কে একটু বসি। তোমার কাজ তুমি করো। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'ছার, এই সা'বে একটা কথা জানবার চায়। তারে কইছি আফনে কইবার পারবেন। উনারে জওয়াবটা দিয়া দেন। ছার, সওয়ালটা হইল, লালমণির হাটের নাম লালমণির হাট হইছে কেমনে?'

'প্রশ্নের জবাব দিলে কি তুমি খুশি হবে?'

'ছার, কাস্টমারগো খুশি হইল আমগো খুশি। তয়, ছার, আফনার অসুবিদা হইলে দরকার নাই। একজনরে খুশি করতে গিয়া দশজনরে অখুশি করন ঠিক না।'

'এতদিন জানতাম নাপিতেরাই দার্শনিকের মত কথা বলে। এখন দেখছি কান পরিষ্কার করাঅলারাও ওই একই গুণের অধিকারী। কান টানলে মাথা আসে। মাথা নিয়েই যখন কারবার। দার্শনিক তো হতেই হবে। যা হোক, আমার অসুবিধা নেই। তবে উনাকে খুশি করার চেয়ে তুমি যাতে অখুশি না হও, সেইটে আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আব্দার একটা যখন করেই ফেলেছ, তখন সেটা রাখব আমি। বলছি শোন। লালমণির হাটে আজ থেকে দেড় শ' বছর আগে ইংরেজরা রেল লাইন বসিয়েছিল। এই রেল লাইন বসাতে গিয়ে শুরু হলো খোঁড়াখুঁড়ি। মাটি খুঁড়তেই পাওয়া গেল অসংখ্য লাল পাথর। এই লাল পাথরকেই ওখানকার লোকেরা বলত লাল মণি। হাটে নিয়ে গিয়ে বেচাও হতে লাগল পাথর। সেই থেকেই ওই জায়গার নাম হলো লালমণির হাট।'

কামাল অমলের দিকে তাকাল। মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি। সেই হাসি কথায় ট্র্যানস্লেট করলে এই রকম দাঁড়াবে: দেখলেন তো! আফনারে কী বলছিলাম? ছার খুব শিক্ষিত।

আগন্তুক এইবার অমলের দিকে নজর দিল। তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আছেন কোথায়?'

'না, তেমন কোথাও না।'

'"তেমন কোথাও না" বলতে?'

'এতদিন এক ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে ছিলাম। তবে এখন আর নেই। বেকারই বলতে

পারেন।'

'বেকারই বললে মনে হয় কিছু না কিছু কাজ-কর্ম আছে। আসলেই কি তা আছে?'

'না, নেই। কোনও কাজই নেই। একেবারেই ঝাড়া হাত-পা। পুরো বেকার।'

'হুঁ। তা আপনি পড়াশুনো কতদূর করেছেন, জানতে পারি?'

'মানিকগঞ্জ কলেজ থেকে বি.কম. পাশ করেছি।'

'বি.কম. তো ভালই। চাকরি তো হওয়ার কথা। সমস্যা কোথায়?'

'চাকরি পেতে হলে পরিচিত লোক থাকতে হয়। না থাকলেও যে হয় না, তা না। তবে অ্যাকাউন্টসের কাজ। প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি নিতে গেলে লাখ খানেক টাকা ডিপোজিট দিতে হয়। ওই টাকাটা জোগাড় করা যাচ্ছে না।'

'আপনার নাম কী, বলেন তো?'

'আমার নাম অমল কান্তি।'

'বিয়ে করেননি কেন? হিন্দু ছেলেরা বিয়েতে পণের টাকা পায়। ওই টাকায় সমস্যার সমাধান হতে পারত।'

'বাড়িতে বিধবা মা আর ছোট-ছোট ভাই-বোন। এদের দেখাশুনোর ভার আমার ওপর। বিয়ে করে লেজে-গোবরে হতে চাইনি।'

'ওরে, বাবা! আপনার জীবন তো দেখি, ভাই, ষাটের দশকের কোলকাতার বাংলা সিনেমা। সে যাই হোক, আপনার একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়তো করতে পারব। তবে ইন্টারভিউ দিতে হবে আপনাকে। যদি পাশ করতে পারেন, তা হলে চাকরি পাবেন। দিতে চান ইন্টারভিউ?'

'দেব। কোথায়, কখন যেতে হবে বলেন।'

'কোথাও যেতে হবে না। যদি চান, তা হলে এখানেই ইন্টারভিউ দিতে পারেন। এখনই।'

'তাই নাকি? কে ইন্টারভিউ নেবে? কোন্ কোম্পানি?'

'আমিই ইন্টারভিউ নেব। পাশ করলে চাকরি করবেন আমার অফিসে। কোন্ অফিস? কোথায় অফিস? এসব জানতে পারবেন ইন্টারভিউ-এ পাশ করার পর। ঠিক আছে?'

'জী, ঠিক আছে। বলেন কী জানতে চান।'

'আমি আপনাকে একটা ধাঁধা বলব। তবে ধাঁধার উত্তর যে এখনই দিতে হবে তেমন কোনও

শর্ত নেই। আগামীকাল সকাল এগারোটা পর্যন্ত সময় পাবেন। ফোন নম্বর দিয়ে যাব। উত্তরটা যদি আগামীকাল দেন, তা হলে ফোন করে জানাবেন। উত্তর সঠিক হলে কোথায় যেতে হবে বলে দেব। কী, রাজি?'

'জী, রাজি। ধাঁধাটি কী?'

'বলছি, মন দিয়ে শোনেন। ধাঁধা বলার সময় বা বলা শেষ হলে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। শুধু উত্তর দিতে পারবেন। আর সেই সুযোগ পাবেন মাত্র একবার। এই শর্তগুলোর একটাও ভঙ্গ করা যাবে না। বোঝা গেছে?'

'জী।'

'ধাঁধাটা হলো এই: একটা লোক তিনটে জিনিস নিয়ে নৌকো করে ছোট একটা নদী পার হবে। কিন্তু নৌকোটা এতই ছোট যে একবারে সে শুধু একটা জিনিসই নিতে পারবে। অর্থাৎ, একেকবারে একটা করে জিনিস নিয়ে ওপারে গিয়ে সেই জিনিসটা রেখে ফের এপারে এসে আরেকটা নিয়ে যাবে। তবে সমস্যা আছে। সমস্যাটা হলো যে তিনটি জিনিস সে ওপারে নিয়ে যাবে–সেগুলোতে। তিনটে জিনিস হলো: একটা শেয়াল, একটা বাঁধা কপি, আর একটা ছোট ছাগল। এখন লোকটা যদি বাঁধা কপি নিয়ে ওপারে যায়, তা হলে শেয়াল ছাগলটাকে একা পেয়ে খেয়ে ফেলবে। আর প্রথমে যদি শেয়াল নিয়ে ওপারে যায়, তা হলে সেই সুযোগে ছাগলটা খেয়ে ফেলবে বাঁধা কপি। লোকটাকে ঠিকঠাক মত এই তিনটে জিনিসই নদীর ওপারে নিতে হবে। কোনটারই কোনও ক্ষতি হতে দেয়া যাবে না। মনে রাখবেন, এপারে যেমন সুযোগ পেলে শেয়াল ছাগলটাকে কিংবা ছাগল বাঁধা কপিটাকে খেয়ে ফেলবে, সেই একই ব্যাপার কিন্তু ঘটবে ওপারেও। এটাই ধাঁধা। এখন বলেন কীভাবে

ঠিকঠাক মত জিনিসগুলো ওপারে রেখে আসা যাবে।'

এতক্ষণ কামাল চুপচাপ ছিল। ধাঁধা শোনার পর সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। আগন্তুককে বলল, 'ছার, সওয়ালের জওয়াব আমি দিলে অইব?'

'তুমি দিতে চাও? ঠিক আছে, দাও। উত্তর যদি সঠিক হয়, তা হলে ধরে নেব অমল বাবু ইন্টারভিউতে পাশ করেছেন।'

'ছার, প্রথমে পার করন লাগব খাসিডারে। এইপারে খ্যাক শেয়ালে তো আর বান্দা কপি খাইতে পারবে না।'

'বেশ, তারপর?'

'হেরপর বান্দা কপিডারে নৌকাত উডায়া নিতে হইব ওইপারে। কপিডারে রাইখা হেরপর এইপারে আইয়া নিব খ্যাক শেয়ালডারে। ব্যস, কাম শ্যাষ।'

'উঁহুঁ "কাম শ্যাষ" না। লোকটা যখন বাঁধা কপি রেখে শেয়াল আনতে যাবে, সেই সুযোগে বাঁধা কপি খেয়ে ফেলবে ছাগল। লোকটা শেয়াল নিয়ে ফিরে এসে দেখবে বাঁধা কপি শেষ। সমস্যাটা বুঝতে পেরেছ?'

'অ্যাঁ? এইডা তো, ছার, খেয়াল করি নাই। বিষয়ডা তো, ছার, মনে লয় বহুত জটিল!'

'তা, কিছুটা জটিল তো বটেই।'

আগন্তুক এবার অমল কান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী ভাবছেন, অমল বাবু? উত্তর কি এখনই দেবেন, না কাল সকাল পর্যন্ত সময় নেবেন?'

'কাল সকাল অব্দি সময় চাই।'

'ঠিক আছে। সকাল পর্যন্ত সময় দেয়া হলো। তবে মনে রাখবেন, এগারোটার পর সঠিক-বেঠিক কোনও উত্তরই গ্রহণযোগ্য হবে না। সময়ই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। সময় হচ্ছে স্বয়ং

ভগবান। এই নেন ফোন নম্বর। উত্তরটা ফোনে জানাবেন।'

'আপনার নামটা তো জানা হলো না।'

'ইন্টারভিউতে পাশ করলে জানতে পারবেন, এখন না।'

উঠে পড়ল আগন্তুক। কামালের হাতে এক শ' টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে ডানে-বাঁয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল পার্ক থেকে। গাড়ির দরজা খুলে দিল ড্রাইভার।

দুই

অমল কান্তি যখন মেসে ফিরল, তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। মেসে ঢোকার সময় দেখা হলো মেস ম্যানেজার বিনয় বোসের সঙ্গে। মান্ধাতা আমলের তেলতেলে হাতলঅলা পিঠ-বাঁকা বেঞ্চিতে পা উঠিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। মেঝের ওপর চামড়ার কোলাপুরি চটি। খুব সম্ভব বিনয় বাবুর শ্বশুরের আমলের। চটির জগতের ডাইনোসর। অরিজিনাল বহু আগেই খতম হয়ে গেছে। মুচির কল্যাণে জোড়া লাগানো ফসিল। পরনে হাতাঅলা সাদা গেঞ্জি, ধুতি। গলায় কাঠের মালা। বেঞ্চের কাঠ যত তেলতেলে, তার থেকেও ঢের বেশি তেলতেলে কাঠের মালা। জন্মের পর থেকেই সম্ভবত বোস বাবুর গলায় ঝুলছে ওটা। মাথার ওপর ঘড়ঘড় করে চলছে পাকিস্তান আমলের হীরা ফ্যান। শেষ কবে ক্যাপাসিটর পাল্টানো হয়েছিল ভগবান বলতে পারবেন। এই ফ্যানের চরিত্র একসময় ফ্যানের মত হলেও এখন এর কুকুর স্বভাব। আওয়াজ যত বেশি, কাজ তত কম।

বিনয় বোস অমলের দিকে ফিরেও তাকালেন না। খবরের কাগজ পড়তেই থাকলেন। অমল যে একটা অপদার্থ সেই ধারণা বিনয় বাবুর একেবারে গোড়া থেকেই। এখন যদি জানতে পারেন তার চাকরি নেই, তা হলে সেই ধারণা হবে ধর্মীয় বিশ্বাসের মত চিরন্তন। রুমে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে চকির ওপর শুয়ে পড়ল অমল। ধাঁধার উত্তর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। সে আছে এক ঘোরের ভেতর। বামুন ঠাকুর এসে খাবার দিয়ে গেছে। ইলিশ মাছের মাথা আর কাঁটাকুটি দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো ঘন্ট। তার সঙ্গে করলা ভাজি, অড়হরের ডাল। টেনশনের ঠেলায়

খিদেই নষ্ট হয়ে গেছে। এ জীবনে কত অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি যে হতে হয়! ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান। নিজের অস্তিত্ব, মা-ভাই-বোনের খোরপোষ–সব নির্ভর করছে একটা ধাঁধার উত্তরের ওপর। হায়রে নিয়তি!

অমলের মনে পড়ল কলেজে ইংরেজি প্রফেসরের বলা একটা গল্পের কথা। অনেক দিন আগে লণ্ডনের নাম যখন লণ্ডনিয়াম, তখন সেখানে গ্রাম থেকে অভাবের তাড়নায় এক যুবক এসে হাজির হলো। হন্যে হয়ে কাজ খুঁজতে লাগল ছেলেটি। দিন যায়, যায় সপ্তাহ, কিন্তু কাজ আর পায় না। এদিকে শেষ হয়ে এসেছে পকেটের রেস্ত। একদিন গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে কখন যে সে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে পড়েছে, খেয়ালই করেনি। আসলে রাজপ্রাসাদ দেখতে কেমন সেইটেই জানত না। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রাজপ্রাসাদ দেখতে লাগল সে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এক জনসমাবেশ। বড় একটা পাথরের প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। বিষয় কী? না, এক যুবকের শিরচ্ছেদ হচ্ছে। শিরচ্ছেদের কারণ রাজকন্যার ধাঁধার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে সে। খোঁজ-খবর নিয়ে গ্রাম থেকে আসা যুবক জানতে পারল রাজকন্যাকে যে-কোনও ছেলে বিয়ে করতে পারে। শর্ত হলো: তার ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে হবে। ভুল উত্তর দিলে কাটা পড়বে মুণ্ড। ধাঁধার উত্তর ভেবেচিন্তে বের করার জন্যে এক বছর সময় দেয়া হবে। যুবক ভাবল জীবনে ঝুঁকি একটা নিতেই হবে তাকে। নো রিস্ক নো গেইন। প্রাসাদের গেটের সামনে রাখা ইয়া বড় কাঁসার ঘণ্টায় বাড়ি দিয়ে রাজকন্যাকে বিয়ের ইচ্ছে জানাল যুবক। এরপর তাকে নেয়া হলো রাজদরবারে। সেখানে রাজার পাশে বসে রাজকন্যা শোনাল তার ধাঁধা। বলতে হবে: 'মেয়েরা কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশি কামনা করে।' এক বছর সময় দেয়া হলো যুবককে। দেয়া হলো প্রচুর টাকা-পয়সা, থাকার জায়গা, চাকর-নফর। সেই সঙ্গে রাখা হলো প্রহরী–যুবক যাতে পালাতে না পারে। ঘোরাঘুরির স্বাধীনতা তার আছে। তবে ঘুরতে হবে পায়ের গোড়ালিতে প্রহরী নিয়ে। প্রথম ছ'মাস যেখানে যত বই পেল, সব পড়ার চেষ্টা

করল যুবক। এরপর ধর্মগুরু, সমাজগুরু, দার্শনিকগুরু–এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে কাটাল আরও পাঁচ মাস। কিন্তু নাহ্। নিশ্চিন্ত হওয়ার মত কোনও উত্তরই পাওয়া গেল না। বাকি আছে আর মাত্র ত্রিশ দিন! প্রথম পনেরো দিন কাটল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। তার পরের সপ্তাহ শেষ হলো নিজের কামরায় সকাল-সন্ধ্যা শুয়ে-বসে। আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি! যুবক সিদ্ধান্ত নিল শেষ দিনগুলো নদীর ধারে বসে কাটাবে। নদীর ধারে সারাদিন বসে থাকে সে। তাকিয়ে থাকে টলটলে জলের দিকে। দেখতে পায় পাল তোলা নৌকো। ওপারে সবুজ ফসলের খেতে কাজ করছে কৃষক। দুপুরে গাছতলায় বসে বউয়ের আনা খাবার খাচ্ছে। গ্লাসে জল ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে বউ। খাওয়া শেষ হলে থালাবাটি নদীর জলে ধুয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে কৃষক-বউ। আহ্, কী মধুর এই জীবন! শুধু যদি বেঁচে থাকতে পারতাম! কী কুক্ষণেই যে রাজকুমারীকে বিয়ে করার সাধ জেগেছিল! বামুন হয়ে চাঁদে হাত! এখন আম-ছালা সবই গেল–মনে মনে ভাবে যুবক। খুব আফসোস হয় তার। কিন্তু কী আর করা? এক বছর পূর্ণ হতে আর যখন মাত্র একদিন বাকি, ভয়ানক মুষড়ে পড়ল সে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগল মাথা হেঁট করে। কোন্‌দিকে যাচ্ছে খেয়াল নেই। খেয়াল করেই বা কী লাভ? হঠাৎই লক্ষ করল নির্জন এক জায়গায় চলে এসেছে সে। সামনেই ভাঙাচোরা আদ্যিকালের মন্দিরের মত কী যেন। ঝকঝক করছে নিরেট পাথরে তৈরি চত্বর। যুবক ভাবল মন্দির-চত্বরে কিছুক্ষণ বসবে। মনটা হয়তো হালকা হবে এতে। ভেঙে পড়া একটা পাথরের দেয়ালের ওপর বসে আবারও গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। হঠাৎ মনে হলো পা টেনে টেনে কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল, লাঠিতে ভর দিয়ে খুনখুনে এক বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ধনুক-বাঁকা পিঠ, শণের গোছা চুল, মুখ কোঁচকানো টমেটো, শালগম থুতনি। অল্প-স্বল্প দাড়িও আছে সেখানে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই থাকতে পারছে না। একদিকে হেলে যাতে পড়ে না যায় সেই প্রচেষ্টাতেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে শরীরের সবটুকু বল। যুবককে তার দিকে

তাকিয়ে থাকতে দেখে মুখ খুলল বুড়ি। ওখানে আছে কালো ছোট একটা জিভ আর গোলাপি মাড়ি। দাঁত নেই একটাও। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে গাছের ডালে বসা পাখি উড়ে যাবে। বুড়ি বলল, 'কী, নাতি, এই বয়সেই এত চিন্তা কীসের? এটা তো ফুর্তি করার সময়। যা হবার তা-ই হবে। কী হবে আর ভেবে ভেবে? বরং শুঁড়িখানায় যাও। উড়িয়ে দাও দু'চার পেগ। এরপর ডবকা দেখে এক ছুঁড়ি জোগাড় করে নিয়ে যাও বাড়িতে। আয়েশ করো।'

বুড়ির কথা শুনে দুঃখের ভেতরও হেসে ফেলল যুবক। বলল, 'শোনেন, বুড়ি মা। বিরাট বিপদের ভেতর আছি। মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করতে চাইলেও পারব কি না কে জানে!'

'এই কাঁচা বয়সে আবার কী সমস্যা গো, নাতি? কুমারী মেয়ের পেট বাধিয়ে ফেলেছ? নাকি কারও বউয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে সব লেজেগোবরে করেছ?'

'আরে, বাবা, এসবের কোনটাই না। আমার সমস্যা, জীবন-মরণ সমস্যা। নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছি। এখন আর কে বাঁচাবে? জীবনে করতে পারলাম না কিছুই।'

'সমস্যাটা বলোই না শুনি। সমাধান তো হয়েও যেতে পারে। কে জানে!'

'আচ্ছা শোনেন তা হলে। এমনিও মরব, ওমনিও মরব। আপনার আকাঙ্ক্ষা তো পূর্ণ হোক।'

যুবক বুড়িকে সব খুলে বলল। সব শুনে বুড়ি বলল, 'শোন, নাতি, সমস্যার সমাধান আমি করে দেব। তবে শর্ত আছে।'

'নে, বাবা। খালি শর্ত আর শর্ত। শর্ত ছাড়া জীবনে কি কিছু নেই নাকি? ওসব শর্ত-ফর্তের মধ্যে আমি আর নেই। এমনি এমনি বললে বলেন, না হলে রাস্তা দেখি। কপালে মরণ লেখা থাকলে কারও বাবাও ঠেকাতে পারবে না।'

'আরে, বাবা, আগে শোনই না! শর্ত শুনে যদি মনে হয় মানতে পারবে, তা হলে আর কথা কী? শর্ত বলব?'

'আচ্ছা বলেন, কী শর্ত?'

'শর্ত হলো ধাঁধার উত্তর বলে দেব আমি। তবে তুমি রাজকন্যাকে বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে করবে আমাকে।'

'এ আবার কী শর্ত! আপনার বয়সের তো গাছ-পাথর নেই। কবরে এক পা চলেই গেছে। এখন বিয়ে-শাদি বাদ দিয়ে ভগবানকে ডাকেন। আপনার হাঁটুর বয়সও হবে না আমার। এ অসম বিয়ে হলে হাসাহাসি করবে লোকে।'

'ভেবে দেখো, তোমার জীবন তো বাঁচবে। আমি থুরথুরে বুড়ি। ফট করে মরে যাব যে-কোনও দিন। তারপরেই তুমি মুক্ত। যাকে খুশি বিয়ে করতে পারবে। কী, রাজি?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার শর্ত মেনে নেব। এখন ধাঁধার উত্তর বলেন।'

'কাল সকালে রাজকন্যাকে গিয়ে বলবে, "সব মেয়ের কামনা একটাই: স্বামীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব।"'

পরদিন সকালে রাজদরবারে গিয়ে রাজকন্যার ধাঁধার উত্তর দিল যুবক। খুশি হলো রাজকন্যা। রাজকর্মচারীদের বলল বিয়ের আয়োজন করতে। কিন্তু বাদ সাধল যুবক। বলল, 'মহামান্য রাজকন্যা, ধাঁধার উত্তর বার করতে গিয়ে আমাকে এত বেশি দুশ্চিন্তা করতে হয়েছে যে বিয়ের সাধ মিটে গেছে আমার। এখন যদি প্রাণ ভিক্ষা দেন তো বাঁচি। যদি অনুমতি দেন তো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে চাই।'

যুবক মনে মনে ভেবে রেখেছিল রাজদরবার থেকে বেরিয়েই সোজা নিজ গ্রামে ফিরে যাবে। বাড়িতেই কাটাবে বাকি জীবন। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছে। বারবার ভাগ্য সহায়তা করবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরুতেই দেখল রাস্তার ধারে সেই খুনখুনে বুড়ি দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা করছে তার জন্যে। আদ্যিকালের কোঁচকানো সাদা পোশাক পরে এসেছে। এককালে পোশাকের রঙ হয়তো সাদা ছিল, তবে কালের পরিক্রমায় বর্তমানে অফহোয়াইট।

মাথায় লম্বা সাদা স্কার্ফ। হাতে ফুলের তোড়া। বিয়ের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বুড়ি আর যুবকের বিয়ে হয়ে গেল দুপুরের আগেই। বিকেলটা তারা কাটাল শুঁড়িখানায় মদ খেয়ে। এরপর ফুলশয্যার রাত। প্রচণ্ড মন খারাপ যুবকের। কী ভেবেছিল আর কী হলো? কোথায় ঢলঢলে যুবতী রাজকন্যা আর কোথায় এই কুৎসিত থুরথুরে বুড়ি! ওহ্, ভগবান, এর থেকে মরলেই ভাল ছিল! যুবককে বিছানায় বসিয়ে রেখে বুড়ি গেল কাপড় পাল্টাতে। বুড়ি গেছে তো গেছেই। এদিকে বিছানায় বসে চোখের জল ফেলছে যুবক। হঠাৎ কাপড়ের খসখস শব্দে সংবিৎ ফিরল তার। বুঝতে পারল অপূর্ব সুগন্ধে ভরে গেছে ঘর। কোত্থেকে যেন নীলাভ আলোও আসছে। মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল অনিন্দ্যসুন্দরী এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। চোখের তারায় আলোর ছটা, পাতলা গোলাপি ঠোঁটের নিচে মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁত। টোল পড়া গালে ভুবন-ভোলানো হাসি। চোয়াল ঝুলে পড়ল যুবকের। এ আবার কোন্ নাটক শুরু হলো! যুবতী বলল, 'কী হলো, চিনতে পারছ না? এরই মধ্যে ভুলে গেলে বউকে?'

'কিন্তু আমার বউ তো তুমি নও। আমার বউয়ের বয়স আমার দাদীর চেয়েও বেশি।'

'ও, বাবা! বিয়ের পর একটা দিনও যায়নি, এরই মধ্যে খোঁটা দিয়ে কথা বলতে শুরু করেছ?'

'যা সত্যি তা-ই বলছি। ছল-চাতুরি বুঝি না আমি।'

'আমিই সেই বুড়ি। আমি আসলে ডাইনী। ইচ্ছেমত রূপ বদলাতে পারি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, সেজন্যেই বিয়ে করেছি। এখন বলো, আমাকে কোন্ রূপে পেতে চাও? যদি বলো এখন যেমন আছ তেমনই থাকো, তা হলে একটা শর্ত মানতে হবে–এইটে দাবি করতে

পারবে না যে আমি সতীপনা দেখিয়ে বেড়াব। যাকে মনে ধরবে, তার সঙ্গে প্রেম করার অধিকার চাই আমি। আর যদি আগের রূপে থাকতে বলো, তা হলে কথা দিচ্ছি, কারও দিকে ফিরেও তাকাব না কোনও দিন। আমি শুধু তোমারই থাকব। এখন বলো কোন্‌টা চাও।'

সব শুনে যুবক বলল, 'শর্ত শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে আমার। তোমরা মেয়েরা শর্ত না জুড়ে কথাই বলতে পারো না। যা মন চায় করো, বাবা। যেভাবে থাকতে চাও, থাকো। বিয়ে যখন করেই ফেলেছি, তখন বুড়িই কী আর ছুঁড়িই কী? বাদ তো আর দিতে পারব না।'

যুবকের কথা শুনে খুশি হলো ডাইনী। বলল, 'বাব্বা, জনাবের রাগ তো কম নয় দেখছি! আচ্ছা যাও, এখন যেভাবে আছি, আমাকে পাবে সেভাবেই। আর পুরো বিশ্বস্তও থাকব চিরকাল। কী, দুলহা রাজা, হয়েছে? এবার একটু হাসো তো দেখি।'

সূত্রাপুর থানার পেটা ঘড়িতে ভোর চারটে বাজার আওয়াজ শুনল অমল। খিদেয় গুড়গুড় করছে পেট। ভাত খেতে গিয়ে দেখল টক হয়ে গেছে অড়হরের ডাল। করলা ভাজি অ্যায়সা তেতো যে মুখেই দেয়া যাচ্ছে না। মিষ্টি কুমড়োর ঘন্টে ইলিশ মাছের চ্যাপ্টা কানকোর ছোট একটা টুকরো ছাড়া অন্য কিছু নেই। কী আর করা, কানকোর টুকরোটাই চুষে খেল। বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিতেই ঘুম নেমে এল চোখে। রাতে স্বপ্ন দেখল ইস্ট লণ্ডনের তস্য গলির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। সুনসান নীরবতা। রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টের কয়লা পোড়ানো গ্যাস-বাতির টিমটিমে ভুতুড়ে আলোয় হঠাৎ করেই চোখে পড়ল ক্ষুর দিয়ে ফালি-ফালি করে কাটা যুবতী নারীর লাশ। রক্তে মাখামাখি ধূসর রঙের গাউন, দুধ-সাদা নিটোল বুক। কবোল স্টোন রোডের পাথরের খাঁজ বেয়ে থিকথিক করে গড়িয়ে যাচ্ছে রক্ত। যুবতীর হাত-পাগুলো তিরতির করে কাঁপছে তখনও। লম্বা-লম্বা পা ফেলে তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে কালো রঙের গ্রেট কোট আর মাথায় চার্চিল হ্যাট পরা জ্যাক দ্য রিপার। বিড়বিড় করে বলছে, 'এই

বেশ্যা মাগিটাও আমার ধাঁধার উত্তর দিতে পারল না। কিছু দিন পর আর একটাকে ধরতে হবে। যত্তসব অপদার্থের দল!'

তিন

অমলের ঘুম ভাঙল সকাল আটটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ধাঁধার কথা। কিন্তু কোথায় উত্তর? আগে যে তিমিরে ছিল, এখনও সেই তিমিরেই আছে। অমল ভাবল, মেস থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটবে। সকালের আলো-হাওয়ায় মাথাটা খোলতাই হবে। বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেল টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে সদরঘাটে চলে এল অমল। আহসান মঞ্জিলের কাছে বুড়িগঙ্গার ধারে বসল। এপারে সদরঘাট, ওপারে কেরানিগঞ্জ। ছোট-বড় নৌকোয় লোক পারাপার হচ্ছে। বাঁশের মাচায় বসে আছে যেসব মাস্তানেরা, ঘাট ডেকেছে তারা। দু'টাকা ভাড়া দিয়ে নৌকোয় উঠতে হয়। আশপাশে চা-পান আর বিড়ি-সিগারেটের দোকান। এক ঘণ্টা ধরে লোক পারাপার দেখল অমল। দশটা বেজে গেল। ধাঁধার উত্তর মিলছে না কিছুতেই। আর মাত্র এক ঘণ্টা আছে। কিছু ভেবে বার করতে পারলে ভাল। না হলে? নাহ্, পরের অংশটুকু আর ভাবতে চায় না অমল।

হঠাৎ করেই তার মনে হলো, বসে থেকে আর কী হবে। তার চেয়ে বরং একবার এপার-ওপার করে দেখা যাক। নদীর জোলো বাতাসে মাথাটা খুললেও খুলতে পারে। দু'টাকা দিয়ে টিকেট কেটে নৌকোয় চড়ে বসল অমল। নৌকো প্রায় ভরেই গেছে। ছেড়ে দেবে যে-কোনও সময়। ঠিক তখনই ছাতা বগলে নিয়ে হনহন করে ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা ধুতি পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক ঘাটে এসে উপস্থিত হলো। টিকেট কিনে নৌকোয় উঠতে যাবে, এমন সময় কী মনে করে পিছিয়ে এসে পানের দোকানে গিয়ে এক খিলি পানের অর্ডার দিল লোকটা। ছাতাটা দোকানের শোকেসের সঙ্গে হেলান দিয়ে রেখে বিল মিটিয়ে পানের বোঁটায় চুন নিতে লাগল। ওদিকে নৌকো প্রায় ছেড়ে দিয়েছে পারানি। লোকটাকে দেখে মনে হলো, হুড়োহুড়ি করে নৌকোয় ওঠার কোনও তাড়া নেই। ভাবছে, ধীরেসুস্থে পরের নৌকোয় গেলেই

চলবে। এমন সময় নৌকোর ওপর থেকে কেউ একজন দেখতে পেল লোকটাকে। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'এই যে, জামাইবাবু, এই, জামাইবাবু!'

মুখভর্তি পান নিয়ে চমকে ফিরে তাকাল লোকটা। হাসি মুখে এগিয়ে এল নৌকোর দিকে। নৌকোয় উঠে যে ছেলেটা তাকে ডেকেছিল, তার পাশে বসতে বসতে বলল, 'আরে, ফটিক! তুই কোত্থেকে?'

'মানিকগঞ্জ থেকে আসছি, জামাইবাবু। মেজদি'র ওখানে গিয়েছিলাম।'

'ওহ্, তাই নাকি? তা ওরা সব ভাল তো?'

'আজ্ঞে ভালই। কিন্তু আপনি এখানে? ওপারে যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ রে, ফটকে। ওপারে এক লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

এরপর এটা-সেটা নানান কথা বলাবলি করতে লাগল শালা-জামাইবাবু। নৌকো ভিড়ে গেল ঘাটে। এক-এক করে সবাই নেমে গেল। নামল শালা-জামাইবাবুও। অমল নৌকো থেকে নামলই না। এই নৌকোতেই ওপারে ফিরে যাবে সে। পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে যাবে, ঠিক এমন সময় থমকে দাঁড়াল জামাইবাবু। বলল, 'এই, যাহ্। ওরে, ফটকে, ছাতাটা যে ওপারে ফেলে এলাম আমি! তুই এক কাজ কর। দাঁড়া এখানে। দশ-পনেরো মিনিটেরই তো ব্যাপার। ওপারে গিয়ে পানের দোকান থেকে নিয়ে আসি ছাতাটা। নতুন ছাতা। হারিয়ে ফেললে মাথা ফাটিয়ে ফেলবে তোর বড়দি'। এত করে বললাম ছাতা-ফাতার দরকার নেই, তারপরেও জোর করে দিয়ে দিল। বলল, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। জলে ভিজে জ্বর বাধালে রুগী টানতে পারব না। এখন যদি গিয়ে বলি ছাতা হারিয়েছি, তা হলে বাড়ি মাথায় তুলবে। কেন যে বিয়ে করে মানুষ! এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পিছালেও নির্বংশের ব্যাটা!'

ঘুরে এসে ফের নৌকোয় উঠল জামাইবাবু। অমলের সঙ্গেই ওপারে ফিরে যাবে। নৌকো ছেড়ে দিতেই সদরঘাটের দিকে তাকাল অমল। লক্ষ করল জামাইবাবুও ওদিকেই তাকিয়ে আছে। আর ঠিক তখনই ধাঁধার উত্তরটা মাথায় এল অমলের। চট করে হাতঘড়ির দিকে তাকাল অমল। সাড়ে দশটা বাজে। নদী পার হতে

লাগবে পনেরো মিনিট। ওপারে পৌঁছার পর সময় হাতে থাকবে মাত্র পনেরো মিনিট। এই পনেরো মিনিটের ভেতরই ফোনের কাছে পৌঁছতে হবে। এখন সময় মত ফোন পেলে হয়। তীরে এসে শেষে না আবার তরী ডোবে!

চার

ওপারে পৌঁছে হন্যে হয়ে ফার্মেসি খুঁজতে লাগল অমল। ফোন থাকলে ওখানেই থাকবে। দশ মিনিট ধরে খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল ফার্মেসি। কাউন্টারের একপাশে রাখা হয়েছে ফোন। পাশে ফুলস্কেপ কাগজে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে লেখা: 'প্রতি কল দশ টাকা। তিন মিনিট পর প্রতি মিনিট এক টাকা।' দিন-দুপুরে ডাকাতি। ফার্মেসির ওষুধ বেচে যা আয়, তার থেকে ঢের বেশি টেলিফোন থেকে। খালি নেই ফোন। এক লোক কথা বলছে। কাজের কোনও কথা না। ফালতু আলাপ। ফার্মেসির লোকটাকে অমল জানাল, সে ফোন করতে চায়। জরুরি। লোকটা বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন একজন লাইনে আছে। ওর কথা শেষ হোক, তারপর বলবেন।'

এদিকে দু'মিনিট শেষ।

এগারোটা বাজতে তিন মিনিট বাকি!

খেপে গেল অমল। ফার্মেসির লোকটার হাত জোরে চেপে ধরে বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন না। খুব জরুরি ফোন করতে হবে আমাকে। ওই লোকটাকে বলেন ফোন রাখতে। বুঝেছেন?'

অমলের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

আর দু'মিনিট বাকি!

এইবার মাথা খারাপের মত হয়ে গেল অমলের। ছুটে গিয়ে রিসিভার কেড়ে নিয়ে লাইন কেটে দিল সে। কিন্তু ফোন নম্বর! কোথায় ওটা? গতকাল যে শার্ট পরেছিল, ফোন নম্বর লেখা কাগজটা ছিল সেই শার্টের পকেটে। আসার সময় কোন্ শার্ট পরে এসেছে মনে করতে পারল না। 'হে, ভগবান, রক্ষে করো,' মনে-মনে ভাবল অমল।

নাহ্, ভাগ্য ভাল।

ওই একই শার্ট আজ সকালেও পরে বের

হয়েছে সে। মনের ভুলেই হয়তো পরেছে। যা হোক, পকেটেই আছে নম্বরটা।

এগারোটা বাজতে আর এক মিনিট বাকি!

রিং হচ্ছে।

তিনবার রিং হতেই ওপারে কেউ ফোন ধরল। আগন্তুক তার নাম বলেনি। অমল ধরেই নিল ও প্রান্তে আগন্তুকই ধরেছে ফোনটা।

'হ্যালো, অমল বলছি। আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি।'

'ধাঁধার উত্তরটা দিতে চাই। বলব?'

'বলেন।'

'প্রথমে পার করতে হবে ছাগলটাকে।'

'বেশ। তারপর?'

'এরপর বাঁধা কপিটা নিয়ে এপারে আসতে হবে।'

'বলে যান।'

'বাঁধা কপিটা এপারে রেখে আবার ছাগলটাকে উঠিয়ে নিতে হবে নৌকোয়। তারপর ছাগলটাকে ওপারে রেখে নিয়ে আসতে হবে শেয়ালটাকে। শেয়ালটাকে এপারে বাঁধা কপিটার সঙ্গে রেখে নৌকো নিয়ে আবারও ওপারে ফিরে যেতে হবে। তারপর ছাগলটাকে নৌকোয় উঠিয়ে নিয়ে আসতে হবে এপারে। ব্যস, পার হয়ে যাবে তিনটে জিনিসই। ক্ষতি হবে না কোনওটারই। কয়বার পারাপার করা যাবে এ ব্যাপারে কোনও শর্ত আপনি দেননি। অতএব এটাই সঠিক উত্তর।'

'বাহ্, বেশ চমৎকার বলেছেন তো! ইন্টারভিউতে পাশ করে গেছেন আপনি। শর্ত পূরণ করেছেন ঠিকঠাক মত। এখন আমার পালা। কোথায় আসতে হবে বলে দিচ্ছি। কাগজ-কলম আছে হাতের কাছে?'

'জী, আছে।'

'বেশ, ঠিকানা বলছি। লিখে নেন। ইচ্ছে করলে আজকেই বিকেল চারটার ভেতর জয়েন করতে পারেন।'

ফার্মেসির লোকটাকে ইশারায় কাগজ-কলম দিতে বলল অমল। তারপর লিখে নিল ঠিকানাটা। টেলিফোনে কথা-বলা লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। চোখে-মুখে রাগ। অমলের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ার জন্যে সম্পূর্ণ

প্রস্তুত। 'লোকাল মাস্তান হলে খবর আছে,' মনে-মনে ভাবল অমল। তাড়াতাড়ি লোকটার হাত ধরে বলল, 'স্যর, কিছু মনে করবেন না। খুব জরুরি ফোন ছিল ওটা। চাকরির ইন্টারভিউ। এগারোটার ভেতরেই ফোন করার কথা। এজন্যেই আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করতে হয়েছে। মাফ করে দেন।'

'চুপ কর্, ব্যাটা। বাতেলা করার জায়গা পাস না। তুই পার করছিস ছাগল, শেয়াল আর মিষ্টি কুমড়ো না কী ঘোড়ার ডিম। চাকরির ইন্টারভিউ এটা! গাঁড়ল পেয়েছিস আমাকে? যা খুশি তা-ই বোঝাবি? আমার জরুরি কথা শেষই হয়নি।'

'স্যর, শোনেন, আপনার যা বিল হয়েছে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি আবার ফোন করেন। এই যে, ফার্মেসির ভাই, উনার বিলটাও রাখেন। সঙ্গে দশ টাকা এক্সট্রা। পরের কলটার জন্যে।'

এবারে কাজ হলো। ফার্মেসির লোকটার দিকে তাকিয়ে মাস্তান এমন ভাব দেখাল, যেটাকে ভাষায় রূপান্তর করলে এই রকম হবে: দেখলি তো, কীভাবে লোককে টাইট করি? আমার সঙ্গে বিটলামি!

পাঁচ

কাগজে লেখা ঠিকানায় যে বাড়ি পাওয়া গেল, সেটা ধানমণ্ডি লেকের ধারে। পনেরো ফুট দেয়ালের ওপর পাঁচ ফুট কাঁটাতার। বিশ ফুট উঁচু গেট। এ বাড়ি এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। বড় গেটের পাশেই দেয়ালে লাগানো ছোট গেট। সবখানে ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা বসানো। পিপ-হোল টিপ-হোলের কোনও কারবারই নেই। তবে কলিং বেল আছে। কলিং বেল চাপতেই ছোট দরজা খুলে বেরিয়ে এল সাদা উর্দি পরা এক লোক। পেটা শরীর। উপজাতীয় টাইপ চেহারা। এ আসলে নেপালি গুর্খা। গুর্খা দারোয়ান রাখার চল ছিল ব্রিটিশ আমলে। পাকিস্তান পিরিয়ডে বিহারী দারোয়ান রাখা হত। ইয়া বড় গোঁফ। পালোয়ানের মত শরীর। এখন রাখা হয় চল ভাঙা, লুঙ্গি-পরা বাঙালি দারোয়ান। এদের প্রধান কাজ বাড়ি পাহারা দেয়া নয়। প্রধান কাজ হলো চাকরানিদের সঙ্গে ফিল্ডিং মারা আর বাড়ির সামনে মুদি দোকানে গিয়ে দোকানদারের সঙ্গে

আড্ডা দেয়া। এ ছাড়াও আরও একটা কাজ আছে। সেটা হলো একে-তাকে ধরে কোনও রকমে একটা সরকারি অথবা বেসরকারি ফার্মে চাকরি ম্যানেজ করা যায় কি না, অনবরত সেই চেষ্টা করা।

গাড়ি বারান্দার দু'দিকে সবুজ ঘাসের বেডে ফুল গাছের ঝাড়। ফুল যা ফুটেছে, তা সবই লাল। লাল-সবুজের সমারোহ। এ লোক প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা নাকি? মনে-মনে ভাবল অমল। নেপালি দারোয়ান অমলকে নিয়ে ছোট একটা অফিস ঘরে বসাল। সেখানে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে ম্যানেজার মেম সাহেব বসে কী যেন লিখছে। গায়ের রঙ দেখলে যে কেউ বলবে গ্যালন গ্যালন আলকাতরা মাখানো হয়েছে মহিলার শরীরে। ঝামা কালো বললেও সবটুকু বলা হবে না। হালকা গোলাপি সুতি শাড়ি। খাটো-হাতা সাদা ব্লাউজ। নেপালি বলল, 'মেম সা'ব, নায়া বাবু কো লায়া হুঁ।'

লেখা থামিয়ে মুখ তুলে অমলের দিকে তাকাল ম্যানেজার মেম সাহেব। একটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল অমলের। এত সুন্দর চেহারা জীবনে কখনও দেখেছে বলে তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়ল না। এর তুলনা শুধু জাতীয় জাদুঘরে রাখা কষ্টি পাথরে তৈরি রাধার মূর্তির সঙ্গেই হতে পারে। এর চোখের মণি যদি হয় অমাবস্যার রাত, তা হলে বাইরের সাদা অংশটুকু হবে পূর্ণিমার চাঁদ। বাবার আমলের পাকিস্তানি সিনেমার নায়িকা জেবা আলির নাক। সুচিত্রার কপাল, কপোল আর চিবুক। রাখি গুলজারের ঠোঁট। মধুবালার দাঁত। কাঁধের ওপর ছড়ানো স্ট্রেট কালো রেশমী ক্লিওপেট্রা চুল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তুষারের মত নরম ওগুলো। কে বলে কালো মেয়ে সুন্দরী হয় না? এর পায়ের কাছে রাজা-বাদশারা গড়াগড়ি খাবে। তবে এ মেয়ের উপযুক্ত শুধুমাত্র একজন সম্রাটই হতে পারে। বিষাদ-মাখা চোখ মেলে স্পষ্ট গলায় মেম সাহেব জিজ্ঞেস করল, 'আপনি অমল কান্তি?'

'জী, আমিই অমল কান্তি।'

'একটু বসেন। স্যরকে জানাই আপনি এসেছেন।'

এরপর ইন্টারকমে এক ডায়াল করল মেয়েটা। ওপারে রিসিভার উঠতেই বলল, 'স্যর,

অমল বাবু এসেছেন। নিয়ে আসব? কোথায় বললেন? লিভিং রুমে? আচ্ছা, ঠিক আছে, এখনি নিয়ে আসছি।' এরপর ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটা ফাইল বের করে অমলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলেন। স্যর অপেক্ষা করছেন।' অমল ঘুরে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়ল দরজার ওপর এক প্যানেলে ছয়টা ক্লোজড সার্কিট টিভি স্ক্রিন। আ-চ্ছা, তা হলে এখান থেকেই অমলের আসার ব্যাপারটা টের পেয়েছে ম্যানেজার মেম সাহেব।

ছয়

ম্যানেজার মেমের পিছে-পিছে বিশাল এক হলঘরে এসে উপস্থিত হলো অমল। দোতলা বাড়ির নিচের তলার অর্ধেকটাই বোধ হয় লিভিং রুম। লম্বা-লম্বা আলমারি ভর্তি পাঁজা পাঁজা পুরনো বই। একপাশে কেমিকেল ল্যাবরেটরি। উল্টোপাশে কাঁচের টেবিলের ওপর ইয়া মোটা বেঁটে আর লম্বা সব টেলিস্কোপ। ওগুলোর পাশে ইমেজ প্রিজম আর স্টেইনলেস স্টিলের অ্যাস্ট্রোলোব। খাতা-পেন্সিল, ক্যালকুলেটর। ওদিকটাতে ইঁটের দেয়ালের বদলে বিরাট-বিরাট কাঁচ বসানো। ঘরের ছাতেও কাঁচের পাল্লা বসানো। চাইলেই খোলা যাবে ওগুলো। বার্গান্ডি রঙের ভেলভেটের পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কাঁচের দেয়াল আর ছাত। ঘরের মাঝখানে সাদা রঙের শ্বেত-পাথরে মোড়া নিচু চারকোনা বেদি। সম্পূর্ণ খালি বেদিটা। বেদির পেছনে মজবুত কাঠের পেডেস্টালের ওপর ভারী ছাই রঙা কাপড়ে ঢাকা প্রায় মানুষ সমান কিছু একটা। মূর্তি-টুর্তি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ঘরের আরেকদিকে দুই সেট সোফা। এখানে-সেখানে টেবিল, কুশন, ডিভান, রকিং চেয়ার। যত্রতত্র ফুলদানি। বিশ-ত্রিশটার কম হবে না। সবগুলোতে সাদা ফুল। ফুলের গন্ধে ম-ম করছে ঘরের ভেতরটা। পুরো ঘরটাতেই কালো-সাদা মার্বেল টাইল্‌স্ বসানো। দেখে মনে হয় বিশাল দাবার ছক বানিয়েছে কেউ।

সোফায় বসে আদ্যিকালের একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল সফেদ আগন্তুক। বই না বলে বাঁধানো পাণ্ডুলিপি বলাই ভাল। চোখের ইশারায় অমলকে বসতে বলল সে। এই প্রথম কালো চশমা ছাড়া আগন্তুককে দেখল অমল। অনেকেই

বলে মানুষের চোখ বাঙ্ময়। চোখ যে মনের কথা বলে। এ লোকের চোখ পাথরের। মনের ভাবনা-চিন্তার কোনও ছাপ সেখানে নেই। অসম্ভব প্রাণহীন আর পুরোপুরি নির্লিপ্ত। তার ওপর আবার চোখের পাতার অর্ধেকটা নেই বললেই চলে। কীসে যেন খেয়ে ফেলেছে ওগুলো। কৃষ্ণ সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে আগন্তুক বলল, 'ঠিক আছে, মন্দাকিনী, তুমি এখন যাও।' ফাইলটা অমলের হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনন্য সৌন্দর্যের প্রতীক। 'ফাইলটা খোলেন, অমল বাবু,' আবার কথা বলল আগন্তুক। 'ওখানে ফর্ম আছে। ফর্মগুলো পূরণ করেন। ফর্মগুলোর নিচে চাকরির কন্ট্রাক্ট। ভাল করে শর্তগুলো পড়ে সই করবেন। শর্ত ভঙ্গ করা যাবে না কিছুতেই।'

ফর্ম পূরণ করতে লাগল অমল। ফর্মের ডিটেল অত্যধিক বেশি। চোদ্দ গুষ্ঠির ঠিকুজি-কুলজি চেয়ে বসে আছে। সারাজীবনে কোথায় কী করেছে তার প্রায় পুরোটাই লিখতে হলো। সেই সঙ্গে পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানা আর চারজন আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ নয় এমন লোকের ফোন নম্বর। ভাগ্য ভাল, যারা ইন্সুরেন্স পলিসি কিনেছিল, তাদের ফোন নম্বরগুলো পকেট ডাইরিতে লেখা ছিল। ফর্ম পূরণ করা শেষ হলে বেরুল কন্ট্রাক্টের কাগজ। প্রথম শর্ত যেটা মোটা কালিতে লেখা আছে, সেটি হলোঃ অফিসের কোনও কথা কোনও অবস্থাতেই বাইরে বলা যাবে না। কাউকে না। এই শর্ত ভঙ্গ হলে চাকরি তো যাবেই, সেই সঙ্গে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার কোম্পানির থাকবে।

'কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' কী তা অবশ্য বলা নেই। এবং সমস্যাটা ওখানেই। সম্ভবত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাটা হবে খুবই সূক্ষ্ম এবং সারাজীবন যাতে ভুগতে হয়, সেই রকমের কিছু একটা। শর্তের শেষের দুটো ক্লজে লেখা, সপ্তাহে কয়দিন কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে, ছুটি-ছাটা, আর বেতনের কথা। প্রতি সপ্তাহে সাড়ে সাত হাজার টাকা বেতন। অর্থাৎ মাসে ত্রিশ হাজার। এ তো দেখি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। ত্রিশ হাজার টাকা ছাব্বিশ দিনের মাইনে! খসখস করে সই করে তারিখ বসিয়ে দিল অমল। এরপর কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইল আগন্তুকের দিকে।

পাণ্ডুলিপির ভেতর ডুবে আছে আগন্তুক। তারপরেও অমল চেয়ে আছে এইটে কীভাবে যেন টের পেল লোকটা। তাকাল অমলের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?'

'জী। ফরম পূরণ করা শেষ। জব কন্ট্রাক্টে সই করাও হয়ে গেছে।'

'গুড। কন্ট্রাক্ট ভাল করে পড়েছেন তো?'

'জী, ভাল করেই পড়েছি।'

'দশটা-পাঁচটা অফিস। কাল সকাল থেকেই শুরু করেন তা হলে। আজকে এটুকুই। কাল দেখা হবে। আর, হ্যাঁ, যাওয়ার আগে মন্দাকিনীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন। ও আপনার ছবি তুলবে। চাকরির দরখাস্তের সঙ্গে ছবি থাকা জরুরি।'

বাসা থেকে বেরিয়ে এল অমল। ছবি ওঠাতে গিয়ে মন্দাকিনী অমলের জামার কলার ঠিকঠাক করার জন্যে বেশ কাছে চলে এসেছিল। নাকে এখনও তার চুলের সুবাস লেগে আছে।

সাত

হাঁটতে হাঁটতে ধানমণ্ডি লেক পার হয়ে মিরপুর রোডে এসে পড়ল অমল। ডানে মোড় নিয়ে হাঁটতেই থাকল। সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এসে থামল। এখন কোন্‌দিকে যাবে ভাবতে লাগল সেই কথা। সোজা গেলে নিউ মার্কেট, আজিমপুর হয়ে মেসে ফেরা যাবে। বাস ধরে বাম দিকে গেলে গুলিস্তান, পীর ইয়ামেনী মার্কেট। অমল ভাবল, পার্কে গিয়ে দেখা করবে কামালের সঙ্গে। তবে চাকরি পাওয়ার কথাটা বলা যাবে না। বললেই এক শ'টা প্রশ্ন করবে এই ছেলে। জব সিক্রেসি আউট হয়ে যেতে পারে। প্রথম দিনই সব কিছু ভজকট করে ফেলা হবে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা।

পার্কে এসে সেদিনের সেই বেঞ্চে বসল অমল। চারদিকে তাকিয়ে কামালকে খুঁজল। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না তাকে। এখন কী করবে এই কথা যখন ভাবছে, ঠিক তখনই সালওয়ার-কামিজ পরা বিশ-একুশ বছরের একটা মেয়ে এসে বসল বেঞ্চটার অন্য মাথায়। বেণি করা চুলে ফিতে বাঁধা। পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল। মুখে হালকা মেকাপ, ঠোঁটে লিপস্টিক। নাকে সাদা পাথর বসানো ছোট্ট নাক-ফুল, কানে

নীল পাথরের ছোট ছোট দুল। খাটো হাতা ব্লাউজের বাইরে চমৎকার গোল বাহু। পুরু আঙুলের মাথায় মাংসে ডোবা চিকন চিকন নখ। কামিজের সাইড-কাট যথেষ্ট লম্বা হওয়ায় উরু সহ মাজার গড়ন বোঝা যাচ্ছে। প্রশ্নাতীত উরুর পুরুত্ব আর নিতম্বের গুরুত্ব। অমলের সঙ্গে চোখাচোখি হলো মেয়েটার। চোখে কোনও লাজুক ভাব নেই। তীরের মত সোজা দৃষ্টিতে সীমাহীন আলোর ঝলকানি। এ বারবণিতা। যৌবনে কুক্কুরীও সুন্দর। গায়ের রঙ একটু মাজা-মাজা হলেও স্বাস্থ্য ভাল মেয়েটার। বাজারে-মেয়েছেলেদের যেহেতু যৌনতাই পুঁজি, সে কারণে এদের দেখলেই হৃদয় ঝমঝম করে পুরুষের। মনের জানালা ধরে উঁকি-ঝুঁকি মারা শুরু করে হিয়ার আনাচে-কানাচে যত সুকৃত-বিকৃত কামনা-বাসনা। এদের কাজ নির্ভেজাল আনন্দ দেয়া। দেহ নিয়ে যা খুশি করতে চাও করো। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। তারপর রাস্তা দেখো। কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। নো স্ট্রিং টায়েড। মানুষের আবেগগুলোর ভেতর যৌনাবেগ সব থেকে বেশি শক্তিশালী। এর কাছে পুরুষ অসহায়। অথচ এই আবেগ মেটাতে গেলে কাঁধে নিতে হয় বড় ধরনের দায়-দায়িত্ব, তার কাছে যেটা ভীষণ অপছন্দের। ওদিকে দায়-দায়িত্ব নিলেই যে সব কামনা-বাসনা মিটে যাবে এমনটি ভাবার কোনও কারণ নেই। লাইসেন্সড্ কামনার বাইরেও আছে অসংখ্য আনলাইসেন্সড্ বাসনা। এজন্যেই বারবণিতার অভ্যুদয় মানব-সমাজের ঊষালগ্নে, পরিবার যখন কেবল গড়ে উঠি-উঠি করছে। উদগ্র কামনা-বাসনা যতদিন আছে, ততদিন আছে বারবণিতাও। প্রকৃতি চায় যেভাবেই হোক টিকে থাক মেয়েরা। পেশা নিয়ে বাছ-বিচার করার সময় কোথায়! অদ্ভুত এক আত্মতৃপ্তিও আছে বারবণিতাদের। যত বড়ে বড়ে খাঁ-ই হোক, কাম্যর্ত পুরুষ আসলে ক্রীতদাসেরও অধম। ক্ষণিকের জন্যে হলেও মেয়েরাই প্রভু। একবার যদি মায়া লাগাতে পারে, তা হলে এই প্রভুত্ব হয় চিরকালের। এই দুর্বলতা ঢাকতেই পুরুষের যত হম্বিতম্বি।

সাত-সতেরো ভাবতে ভাবতে অমল সিদ্ধান্ত নিল, কথা বলবে মেয়েটার সঙ্গে। বারবণিতার সঙ্গে বাক্যালাপ করাও এক বিরল

অভিজ্ঞতা। এ সুযোগ প্রতিদিন ঘটে না। খুকুর-খুকুর কেশে গলা-টলা পরিষ্কার করল অমল। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা অনুভব করছে। পুরুষ ঘেঁটে ঘেঁটে মেয়েটাও ঝানু হয়ে গেছে। সে-ও কাশি শুনে বুঝতে পারল, চারের আশপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে মাছ। টোপ খেলেও খেতে পারে। মুচকি হেসে অমলের দিকে তাকাল মেয়েটা। তবে কথা কীভাবে শুরু করবে, এইটে বুঝতে পারছে না অমল। এ লাইনে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। মুচকি হাসির জবাবে অমলও হালকা হাসি হাসল। কিছু একটা বলতে হবে। কিন্তু কী বলবে! 'এই মেয়ে, তোমার নাম কী?' উঁহুঁ, এভাবে হবে না। ওটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের জন্যে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণত যা বলা হয় তা হলো: 'এই, তোর রেট কত?' অথবা শুধুই 'রেট কত?' বাক্যের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে বারবণিতার স্ট্যাণ্ডার্ডের ওপর। অমলের চোখে পড়ল সামনে দিয়ে এক চাঅলা যাচ্ছে। বাতচিত শুরু করার এই এক মওকা। চাঅলাকে ডেকে দু'কাপ চা দিতে বলল অমল। এরপর তাকাল মেয়েটার দিকে।

এইবার কথা বলল মেয়েটা, 'আমার চা লাগবে না। আপনিই খান।'

'আরে, খাও না এক কাপ।'

'আচ্ছা, দেন।'

'নাম কী তোমার?'

'আমার নাম রেখা।'

অবশ্যই আসল নাম না। বারবণিতাদের প্রায় সবার নামই চিত্রনায়িকাদের নামে হয়। এ-ও একধরনের ফ্যান্টাসি। পুরুষদের সঙ্গিনী খেঁদি-বুঁচি না হয়ে জুহি-মাধুরী-রাভিনা-ঐশ্বরিয়া হলে সেটাই সবিশেষ গ্রহণযোগ্য। স্বপ্নেই যখন খাব, তখন বুন্দিয়া-হালুয়া বাদ দিয়ে চমচমই খাই–মনে মনে ভাবল অমল। তবে মুখে বলল, 'বাহ্, সুন্দর নাম। এই নামের বিশেষত্ব কী, জানো?'

'কী?'

'এই নাম থেকে হিন্দু-মুসলমান বোঝা যায় না।'

'হিন্দু-মুসলমান নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনি তো হুজুর না। আপনি আসলে হিন্দু। ঠিক না?'

থতমত খেয়ে গেল অমল। কথার পিঠে কথা বলতে মেয়েরা ওস্তাদ, একথা ঠিক। তবে এ মেয়ের বেশ বুদ্ধি আছে বলেই মনে হলো তার কাছে। বলল, 'ঘাদ দাও এসব। তুমি থাকো কোথায়?'

'কোথাও না।'

'কোথাও না মানে কী?'

'কোথাও না মানে, কোথাও না। আমি থাকি রাস্তায়।'

'কোন্ রাস্তায়?'

'পিচ ঢালা রাস্তায়। হি-হি-হি।'

'হাসছ কেন তুমি? রাস্তায় থাকা খুব আনন্দের বিষয় না।'

'আপনি থাকেন কোথায়? হি-হি-হি।'

'আমি থাকি কোথায় মানে?'

'আপনি থাকেন কোথায় মানে, আপনি কোথায় থাকেন। খালি মানে জানতে চান কেন? বাংলা ভাষা বোঝেন না?'

অমলকে রেগে যেতে দেখে গা দুলিয়ে হাসতে লাগল মেয়েটা। হাসির দমকে কাপ থেকে চা ছলকে পড়ে গেল। মুখের কাছে বাঁ হাত এনে মুখ ঢাকার চেষ্টা করল সে। তারপরেও কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল। কিছুক্ষণ হেসে চোখের জলটল মুছে চুমুক দিল চায়ে। বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি ভাল মানুষ। একটু মজা করলাম। এর বেশি কিছু না।'

অমল জানে বাজারে-মেয়েগুলোর পুরুষদের ওপর কোনও শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। এরা পুরুষদের চোখে শুধু তাল তাল কামনাই দেখতে পায়। পুরুষ মানেই এদের কাছে কাপড় তোলা, মর্দিত হওয়া আর তাদের জঘন্য অশ্লীল কথাবার্তা কান খুলে শোনা। পুরুষেরা বাস্তবে এদের সঙ্গে মিলিত হলেও তাদের কল্পনায় থাকে এদের মায়েরা। মর্দিত হতে হতে এরা শুনতে

পায়: চোপ্, শালী, তোর মায়েরে... তাদের মাদের সঙ্গে এহেন কাল্পনিক আচরণের সরাসরি বহিঃপ্রকাশে অবশ্য ঝানু বারবণিতারা মোটেও চুপ করে থাকে না। কিংবা কুপিত হয়ে পুরুষদের বিচ্যুতও করে না। উল্টো তারা বিদ্ধ করার কাজে আরও উৎসাহ দেয়। উড়াও কল্পনার ফানুস, ঝরাও কামনা! যেমন বহুকাল আগে ঠগিদের সর্দার কোনও নিরীহ পথিককে ভর পেট খাইয়ে-দাইয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলার আগে তার চেলাদের চিৎকার করে বলত: ঝরকা উঠাও, উঠাও ঝরকা। ওটাই মৃত্যু সঙ্কেত।

অমলকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল, 'ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দেন, ভাই। আমরা পথের মানুষ। আমাদের কথা ধরতে নেই।'

'আরে না, কী যে বলো! রাগ করব কেন? আমরা সবাই তো পথের মানুষ। জীবনটাই একটা যাত্রা। আমরা সবাই যাত্রী একই তরণীর। এখান থেকে ওখানে ছোটাছুটি। একদিন সময় সমাপ্ত। বেজে গেল বিদায় ঘণ্টা। শুরু হলো ওপারের যাত্রা। ...তারপর বলো, দুপুরে কী খেয়েছ?'

'দুপুরে ঝালমুড়ি খেয়েছি। আপনি কী খেয়েছেন?'

'আমার কথা বাদ দাও। এসো, তার চেয়ে বাদাম কিনে খাই। এই, বাদামঅলা, দু' শ' বাদাম দাও তো। এক শ' এক শ'। নুন ঝাল বেশি করে দাও। দুটো কাগজে আলাদা করে দিবা।'

মুটমুট করে বাদামের খোসা ভেঙে হাতের তালুতে ঘষে লাল ছিলকা ছাড়িয়ে তারপর ফুঁ দিয়ে ছিলকা উড়িয়ে কুটকুট করে বাদাম খেতে লাগল মেয়েটা। হুমায়ূন আহমেদের হিমুর গল্পে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বারবণিতারা যেভাবে বাদাম খায়, ঠিক সেভাবে। তরুণী মেয়েদের

বাদাম খাওয়া দেখতে চমৎকার–ভাবল অমল। কিন্তু এরপর কী? গল্পের নায়কেরা বারবণিতাদের সঙ্গে শুধু কথা বলে, অন্য কিছু করে না। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মেয়েগুলোর দুঃখ-কষ্টে হিমু উহ্-আহ্ করলেও ওদের কাছ থেকে নিজেকে শত হাত দূরে রেখেছে। দেবদাস চন্দ্রমুখীর গান শুনে, নাচ দেখে আর বোতল-বোতল মদ খেয়ে লিভার পচানো ছাড়া এক্সট্রা কোনও কিছু করেনি। বাজারে-মেয়েছেলেদের দারুণভাবে পছন্দ করলেও তাদের আসল সার্ভিস এরা খুব কেয়ারফুলি এড়িয়ে গেছে। সার্ভিস গ্রহণ করলে পাঠকদের কাছে পতন অনিবার্য হয়ে উঠত। সব সমবেদনা উবে যেত হাড্রেড অক্টেনের মত। পাঠকেরা নিজেরা যা পারে না, নায়ককে তা অবশ্যই পারতে হবে। শুরুর দিকে নায়ক চরিত্রহীন হলেও পরের দিকে তাকে হতে হবে সাধু পুরুষ। একই রকম থাকা চলবে না। চললে সিনেমা ফ্লপ হবে, বই মার খাবে। আর নায়িকারা বাইজী হলেও তারা শুধু নাচ-গান পরিবেশন করবে, 'আসল সার্ভিস' অবশ্যই না। যদিও প্র্যাকটিক্যালি সেটা অসম্ভব। নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দর্শক-পাঠকও যে সেটা বোঝে না, তা নয়। তবুও তারা 'নাচ-গানের বাইরে কিছুই হয়নি'-তে বিশ্বাস করতে চায়। যেটাকে বলে উইলিং সাসপেনশন অভ ডিসবিলিফ। এসব ভাবতে ভাবতে অমল মেয়েটাকে বলল, 'চলো যাই। হোটেলে গিয়ে ভাত খাই বরং।'

'হোটেলে নিয়ে যদি ভাতই খাওয়াবেন, তা হলে বাদাম খাইয়ে খিদেটা নষ্ট করলেন কেন? আচ্ছা, ধরেন খাওয়ালেন। তারপর কী করবেন?'

'জানি না, কী করব। ভাত খেতে চাইলে চলো।'

'আপনি পারবেন না। বাদ দেন এসব দরদ-ফরদ। আপনি আসলে ভাবছেন আরও কিছুটা সময় পার করলে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ওভাবে হয় না। তার চেয়ে বরং বাসায় যান। রেস্ট নেন। ব্যাটা-ঘাঁটা আমাদের ব্যবসা। কে কী পারবে এইটা ঠিকই বুঝি।'

অর্ধেক বাদাম বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখেই উঠে পড়ল মেয়েটা। একবারও পেছন দিকে না তাকিয়ে চলে গেল পার্কের বাইরে। বিকেলের

মরা আলোয় অমল তার চলে যাওয়া দেখল। কী বিষণ্ন হাঁটার ভঙ্গি! এসব মেয়েদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। যতদিন দেহে রস-কষ আছে, ইনকাম আছে। এরপর অসুখ-বিসুখে পঙ্গু হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে খাও। তারপর ড্রেনের পাশে কাপড়েই পেশাব-পায়খানা করে চোখ উল্টে মরো। চলে যাও আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের জিম্মায়। তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়!

আট

পরদিন ঠিক সকাল দশটায় তার 'অফিসে' পৌঁছাল অমল। গুর্খা দারোয়ান সরাসরি তাকে নিয়ে গেল আগন্তুকের কাছে। লিভিং রুমে আগের মতই পুরনো বই খুলে বসে আছে সে। অমলের গুভেচ্ছা-গুডমর্নিং এসব গ্রহণ করে তাকে বসতে বলল আগন্তুক। ট্রলিতে করে কফির সরঞ্জাম সাজিয়ে এনে দুটো কাপে কফি পরিবেশন করল একজন উর্দিপরা খানসামা। আগন্তুক বলল, 'কফি খান, অমল বাবু। কফি খেতে খেতে আপনার কাজ বুঝিয়ে দিই। আপনার কাজ বুঝিয়ে দেয়ার আগে ছোট্ট একটা ভূমিকা প্রয়োজন। ব্যাকগ্রাউণ্ড ইনফর্মেশন ছাড়া বিষয়টা পুরো বুঝতে পারবেন না। আমার নাম দিয়েই শুরু করি। আমার নাম মৃণাল কান্তি। আমার ঠাকুরদা কর্কট কান্তির রাজশাহী এলাকায় জমিদারি ছিল। ছোটখাট জমিদার। তবে সেরিকালচার অর্থাৎ রেশমের ব্যবসা করে অঢেল পয়সা বানিয়েছিলেন। পয়সা বানালেও দাদা ছিলেন সাত্ত্বিক ধরনের লোক। তাঁর জীবন-যাপন ছিল খুব সাধারণ। বাইজী নাচিয়ে কিংবা মদ খেয়ে জুয়া খেলে পয়সা উড়াননি কখনও। বাবাকে মানুষ করেছিলেন কড়া শাসনে। আমার বাবা কৃষ্ণ কান্তি ছিলেন ব্যারিস্টার। খুব নামকরা কেউ না। তবে আয়-ইনকাম খারাপ ছিল না। কোলকাতায় আমাদের বেশ কয়েকটা বাড়ি আর দোকান ছিল। এক খুড়ো দেখাশোনা করতেন। সেখান থেকে বড় অঙ্কের মাসোহারা আসত। জমিদারি বিলুপ্ত হলেও রাজশাহী শহরের প্রপার্টিও রেভেনিউও কম ছিল না। আমার নানার অবস্থাও ছিল বিরাট। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। আরাম-আয়েশের কোনও ব্যত্যয় কখনও

হয়নি। আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন আমার মামা আমাকে একটা ইংলিশ রিট্রিভার কিনে দেন। কুকুর হিসেবে রিট্রিভার দারুণ ফ্রেণ্ডলি। ইংরেজদের কুকুর, বুদ্ধির কথা আর কী বলব। শিকারী কুকুর হিসেবে এদের তুলনা নেই। ধবধবে সাদা রঙ, ইয়া মোটা লেজ, বড়-বড় ভাঙা কান মুখের দু'পাশে লটপট করছে। কুচকুচে কালো নাক আর চোখ। সারা গায়ে তুষারের মত নরম ঝুমকো পশম। ন'বছর বয়স পর্যন্ত কুকুরটা ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। শুধু রাতে শোয়ার সময়ই ওটা আমার কাছ থেকে আলাদা হত। আমার জন্মের তিন বছর পর আমার মায়ের গর্ভপাত হয়। এরপর থেকে প্রায় সবসময় অসুস্থই থাকতেন মা। কুকুরটা ছিল আমার বন্ধু, খেলার সাথী–সব কিছু।

'তখন আমাদের বাড়ি ছিল পুরান ঢাকায়। ন'বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে শুরু হলো পাক-ভারত যুদ্ধ। আমাদের দিন কাটতে লাগল আতঙ্কের ভেতর। প্রহ্লাদ মানে আমার রিট্রিভার সারারাত জেগে বাড়ি পাহারা দিত। আসলে বাউণ্ডারি ওয়ালের ভেতর ঘোরাঘুরি করত। সেই সময়ে একদিন সকালে উঠে দেখি গাড়ি বারান্দার সিঁড়ির ওপর মরে পড়ে আছে প্রহ্লাদ। মুখ দিয়ে গাঁজলা-টাজলা বেরিয়ে একাকার। পাড়ার কেউ তাকে বিষ খাইয়েছিল। গাড়ি বারান্দা থেকে বাড়িতে ঢোকার মূল দরজায় আঁচড়ের দাগ। মারা যাওয়ার আগে প্রহ্লাদ হয়তো আমার কাছে যেতে চেয়েছিল। বাড়িতে বিহারী দারোয়ান ছিল। তারপরেও এই ঘটনা কীভাবে ঘটল বোঝা গেল না। আমার মাথা খারাপের মত হয়ে গেল। রাতদিন প্রহ্লাদের কথা মনে পড়ে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গাড়ি বারান্দার সিঁড়ির কাছে বসে থাকতে লাগলাম আমি। ছোট বেলা থেকেই আমার আঁকাআঁকির হাত ভাল। আমার কাজ হলো বসে বসে প্রহ্লাদের ছবি আঁকা। বাচ্চারা খুব দ্রুত শোক কাটিয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতিই তাদের সেই শক্তি দিয়েছে। কিন্তু আমার ভেতর শোক কাটিয়ে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়তে লাগলাম। শেষমেশ পড়ে গেলাম বিছানায়। শুধু মনে হত এই বুঝি প্রহ্লাদ ফিরে এল। ঘুমের ভেতর স্বপ্নে দেখতাম, ফিরে এসেছে প্রহ্লাদ। কিন্তু সেটা শুধু স্বপ্নই।

বাস্তবে ফাঁকা বাড়ি। শূন্য বাড়ির আঙিনার একপাশে প্রহ্লাদের কাঠের ছোট্ট ঘরটা। প্রহ্লাদের ঘরের সামনে সবুজ ঘাসের ওপর জলহীন কাঠের বারকোশ। ঈশ্বরকে বলতাম, হে, ভগবান, ফিরিয়ে দিন আমার প্রহ্লাদকে। আপনি তো সব পারেন। কিন্তু প্রহ্লাদ আর এল না। আমার মানসিক অবস্থার উন্নতি হবে ভেবে বাড়ি বেচে দিলেন বাবা। উঠে এলেন ধানমণ্ডির এই বাড়িতে। কুষ্টিয়া থেকে নেপালি দারোয়ান আনলেন। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলে তখন প্রচুর নেপালি দারোয়ান ছিল। মোহিনী বাবুই ব্রিটিশ আমলে নেপাল থেকে এই গুর্খা দারোয়ানদের এনেছিলেন। মোহিনী বাবুর ভাই কানু বাবুর সঙ্গে বাবার খুব খাতির ছিল। পাকিস্তান সরকার মোহিনী মিলকে তখন রাষ্ট্রীয়করণ করেছে। অনেকেরই চাকরি চলে যায় এ কারণে।

'বাবা দুর্গের মত নিশ্ছিদ্র করলেন বাড়ির নিরাপত্তা। এখন যে দারোয়ান আছে, তাকে অবশ্য আমি নেপাল থেকেই এনেছি। আগের জন মারা গেছে। আমার মন ভাল করার জন্যে সুন্দর সুন্দর সব ছবিঅলা বই কিনে দিলেন বাবা। প্রথম দিকে পড়তে ভাল লাগত না। নেড়েচেড়ে রেখে দিতাম। তবে অবস্থার পরিবর্তন হলো। আস্তে আস্তে পৃষ্ঠা উল্টে ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। প্রায় সবই রূপকথার বই। এর ভেতর আলিফ লায়লার গল্পের বইও ছিল। যা হোক, একদিন জাপানি রূপকথার বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি, হঠাৎ করেই "হানা সাকা জিজি" বলে একটা গল্প চোখে পড়ল। "শিরো" নামের এক কুকুর, তার করুণ মৃত্যু আর প্রভুভক্তি নিয়ে লেখা অপূর্ব এক কাহিনি। জাপানি ভাষায় শিরো মানে বরফের মত সাদা। কুকুরটা তুষার-শুভ্র হওয়াতেই তার ওই নাম। কাহিনিটার ভেতর আবার এক-দুই লাইনের গানও আছে। দুর্দান্ত গানের কথা। অভিভূত হয়ে গেলাম গল্পটা পড়ে। এরপর জন্তু-জানোয়ার নিয়ে লেখা যত রূপকথা আছে পড়তে লাগলাম সেই সব। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেনের টিণ্ডার বক্স গল্পের সেই সাহসী সৈনিক আর তিন ভয়ঙ্কর কুকুরের কাহিনি। জার্মানির রূপকথার ভেড়ার বিনিময়ে পাওয়া তিনটি কুকুর, যাদের নাম ছিল লবণ, মরিচ আর সরষে বাটা। গ্রিক মিথলজির মৃতদের

রাজ্যের গেট পাহারা দেয়া তিন মাথাঅলা অপরাজেয় কুকুর সারবারস। মোদ্দা কথায়, কুকুর নিয়ে লেখা কাহিনি যা আছে, প্রায় সবই পড়ে ফেললাম। এবং সেগুলো বিশ্বাসও করতে লাগলাম। সব শেষে পড়া শুরু করলাম আলিফ লায়লা। এর নাম হাজার এক আরব্য রজনী। কাহিনির পর কাহিনি। কৃষ্ণ জাদু বা ব্ল্যাক আর্টের ছড়াছড়ি। দেদারসে মানুষ থেকে কুকুরে আর কুকুর থেকে মানুষে রূপান্তর হচ্ছে। তারপর সেই সব কুকুরদের নিয়ে অদ্ভুত কাহিনি। ডাইনী আমিনার খপ্পরে পড়ে সিদি নোমানের কুকুর হওয়া আর তার পরের কর্মকাণ্ড পড়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। বাগদাদের তিন রমণী আর কুলির কাহিনি আর দ্বিতীয় শেখের গল্পের কথা না-ই বা বললাম।

'খুব শিগ্‌গিরই বুঝতে পারলাম, বই পড়ার আগ্রহ কুকুর দিয়ে শুরু হলেও এখন সেটা আর কুকুরে সীমাবদ্ধ নেই। এখন আমার সব আগ্রহ জাদুমন্ত্রে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, জাদুমন্ত্র দিয়ে দিনকে রাত, রাতকে দিন করা সম্ভব। বয়স কম, অনভিজ্ঞ কাঁচা মন। যা পড়তাম, তা-ই বিশ্বাস হত। ব্যাপারটা অনেকখানি স্যান্টা ক্লজে বিশ্বাস করার মত। আলিফ লায়লার আধিভৌতিক জগৎ আমাকে বলতে গেলে মেসমেরাইজ করে ফেলল। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, জীবিত মানুষকে পাথরের রূপ দেয়া সম্ভব কিংবা পাথরের মূর্তিতেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যেমন আলিফ লায়লার জেলে ও দৈত্যের কাহিনির পাথর-রাজকুমার। মনে হলো আমার দরকার শুধু সঠিক জাদুমন্ত্রের। কিন্তু জাদুমন্ত্রের শিক্ষা শহরের বিদ্যানিকেতনগুলোতে দেয়া হয় না। আসলে কোনও বিদ্যানিকেতনেই দেয়া হয় না। এ হলো গোপন বিদ্যা। এর গুহ্যতত্ত্ব শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজনের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকে। এ বিদ্যা গুরু ধরে শিখতে হয়। সেই গুরু খুঁজে পাওয়াও ভীষণ কঠিন। সব জাদুবিদ্যার মূলেই কাজ করে ঐশ্বরিক শক্তি। তবে এই শক্তি ঐশ্বরিক হলেও ওটা আসে প্রিন্স অভ ডার্কনেসের কাছ থেকে। ঈশ্বর এর দায়-দায়িত্ব নেন না। আলিফ লায়লাতে যেসব জাদুকরীদের কথা বলা হয়েছে, তাদের অনেকেই মহান আল্লাহকে স্মরণ করেই

ব্ল্যাক আর্ট প্র্যাকটিস করে। কারণ সব শক্তির আধার ঈশ্বর স্বয়ং। অনেক ধর্মেই উল্লেখ আছে, জাদুমন্ত্র এসেছে দেবদূত কিংবা ফেরেশতাদের কাছ থেকে। মন্ত্রবলে অতিলৌকিক কর্মকাণ্ড দুনিয়ার বুকে তারাই প্রথম শুরু করে। হারুৎ-মারুতের কথা কে না জানে। সূরা আল বাকারাতে বলা হয়েছে, হারুৎ-মারুৎ দুনিয়ায় যেসব লোক জাদু শিখতে আগ্রহী ছিল, তাদের হাতেকলমে জাদু শিক্ষা দিত, এইটে প্রচার করার জন্যে যে, এসব শিখে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। এই দুই ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছিল হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর আমলে ব্যাবিলন নগরীতে।

'ব্যাবিলনে তখন নমরুদের রাজত্ব চলছে। টাওয়ার অভ ব্যাবেল তৈরির জন্যে রাতদিন খেটে মরছে লক্ষাধিক শ্রমিক। একই সঙ্গে এনলিল, ইশথার, মারডক আর শামাশের পুজোয় চারদিকে ধুন্ধুমার। এটেমেনানকি যিগুরাটে চলছে সকাল-সন্ধ্যা এন্তার নরবলি-পশুবলি। নমরুদের রাজত্বে যে যত বড় জাদুকর, সে তত বেশি ক্ষমতাশালী। কামিনী-কাঞ্চন তার দোরগোড়ায় গড়াগড়ি খাচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা। হাজার হাজার টাকমাথা পুরোহিত অনন্ত নক্ষত্রবীথি ছানাছানি করে বের করার চেষ্টা করছে জাদুমন্ত্রের সঠিক তিথি। আসল খোদার কথা কারও মনেও নেই। এসব দেখে ফেরেশতারা খোদার কাছে অনুযোগ করল। তারা খোদাকে বলল, এই মানব জাতি নেমকহারাম। এরা মহান করুণাময়ের ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য। এদেরকে অবিলম্বে শেষ করে দেয়া হোক। খোদা এরই ভেতর মহা প্লাবন পাঠিয়ে নূহ নবীর কওম সহ পৃথিবীর তাবৎ মানুষজন আর পশুপাখি মেরে দুনিয়াকে গড়ের মাঠ বানিয়েছেন। চাইলেই গজব নাজিল করা সম্ভব না। তা করলে ভাঙা-গড়ার খেলা খেলতেই সময় শেষ। মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। খোদা বললেন, মানুষের ভেতর লোভ, মোহ, কাম এইসব আছে। তোমাদের ভেতর নেই। থাকলে তোমরাও অমনটাই করতে। ফেরেশতারা এই কথা শুনে তাদের ভেতর সব থেকে ভাল দু'জনকে বেছে বের করল। হারুৎ আর মারুৎ। খোদার গুণগান তাদের থেকে ভাল কেউ করতে পারেনি। খোদাকে ফেরেশতারা বলল, মানুষের দোষ-ত্রুটি দিয়ে এদেরকে দুনিয়ায় পাঠান। পরীক্ষা হয়ে

যাক, মানুষ ভাল না ফেরেশতা বেশি ভাল। যা হোক, খোদা এই দু'জনকে লোভ, মোহ, কামনা, বাসনা এসব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালেন। পই-পই করে বলে দিলেন চারটি জিনিস কিছুতেই করা যাবে না। শির্ক, ব্যভিচার, মদ্যপান আর নরহত্যা।

'হারুৎ-মারুৎকে টাওয়ার অভ ব্যাবেলের কাছে নামিয়ে দেয়া হলো। নেমেই তাদের দেখা হলো জহুরা নামে এক যুবতীর সঙ্গে। এই রমণী দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি তার গায়ের সুগন্ধ। স্বচ্ছ মসলিনের ভেতর থেকে রূপ যেন ফেটে বেরুচ্ছে। দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চমক, হাসিতে হীরের দ্যুতি। গায়ের চামড়া ঘিয়ে রঙের মখমল। ঠোঁট জর্ডানি কমলার কোয়া। আলেপ্পোর ডালিম অবতল গাল। পারলে তখুনি যুবতীর রাঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ে হারুৎ-মারুৎ। জহুরাকে প্রেম নিবেদন করল তারা। জহুরা দেখল চারে মাছ ভিড়েছে। খেলিয়ে তুলতে হবে। সে বলল, আমাকে পেতে চাইলে আমার আল্লাহকে কুর্নিশ করতে হবে। তার আল্লাহ পাষণ্ড দেবতা মারডক। তবে কুর্নিশ করার আগে মদ খাওয়া জরুরি। যেমন, নামাজ আদায়ের আগে ওজু করা। ওদিকে এসব ব্যাপারে খোদার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হারুৎ-মারুৎ ভাবল খোদার বিষয়টা পরে দেখা যাবে। জহুরাকে না পেলে বেঁচে থাকাই সম্ভব না। মদ-টদ খেয়ে মারডককে কুর্নিশ করল হারুৎ-মারুৎ। জহুরা বলল, বেশ, তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হোক তা হলে। তবে এ মন্দির চত্বরে তো ওসব করা যায় না। শহরের এক কোণে একটা নির্জন বাগান আছে, চলো, সেখানে যাই। বাগানের কাছাকাছি যখন তারা পৌঁচেছে, ঠিক তখনই এক বুড়ো হাবড়া এসে হাজির। ব্যাবিলনের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বুড়ো। ফেরেশতা দু'জনের চোখে-মুখে তালতাল কামনা, অস্থির ভাব, জহুরার চটুল হাসি–এইসব দেখে যা বোঝার বুঝে নিল ভিখিরি। বলল, নগর ক্লোটালের কাছে গিয়ে নালিশ করবে, বলে দেবে সব্বাইকে। ব্যাবিলনের পথে-পথে ব্যভিচার! দেশটার হলো কী!

'জহুরা তখন আরেক শর্ত দিল।

'কী?

'না–এই বুড়ো ভাম শহরে ফেরার আগেই

তার মুখ বন্ধ করতে হবে। সব কিছু জানাজানি হলে মান-সম্মান বলে আর থাকবে না কিছুই। রূপের কারণে ব্যাবিলনে জহুরার এন্তার অনুরাগী।

'হারুৎ-মারুতের মনে পড়ল নরহত্যা করা মানা। তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ওটা না করলেও তো চলছে না! দুটো শর্ত যখন ভেঙেই ফেলেছে, আরও একটা ভাঙলেই বা কী? বুড়োকে গলা টিপে মেরে ফেলল তারা। জহুরাকে বলল, প্রিয়ে, নিজেকে সঁপে দাও এখন।

'কিন্তু এত সহজে ভোলার বান্দি তো জহুরা না। সাত ঘাটের জল সে খেয়ে শেষ করেছে বহু আগেই। বাগানের ভেতর ঢুকে কাপড়-চোপড় খুলে জহুরাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় হারুৎ-মারুৎ যখন দাঁত কেলিয়ে হাসছে, তখন জহুরা বলল, শোনো, বন্ধুরা, এত কিছুই যখন করলে, তখন শেষ আরেকটি কাজ আমার জন্যে করো।

'কী কাজ? না–খোদা তোমাদের প্রতিদিন সন্ধে বেলা সাত আসমানে উঠে যাওয়ার যে গোপন বিদ্যেটা শিখিয়ে দিয়েছেন, সেইটে আমাকে বলে দাও।

'এই বিদ্যা পৃথিবীর কাউকে শেখানো মানা। হারুৎ-মারুৎ তখন কামনার আগুনে পুড়ে ঝামা ইঁট। তারা ভাবল, এই যুবতী যা চায়, দিয়ে দিই। যেভাবেই হোক একে বিছানায় তুলতে না পারলে আর চলছে না। যাহা বায়ান্ন তাহা তেপান্ন। সাত আসমানে ওঠার গুহ্য বিদ্যা জহুরাকে শিখিয়ে দিল ফেরেশতা দু'জন।

'বিদ্যা শেখা মাত্র জহুরা উঠে গেল আকাশে। খোদা তাকে শুক্র গ্রহে পরিণত করলেন। ফেরেশতা দু'জন রয়ে গেল ব্যাবিলনের সেই আগাছা ভর্তি রোঁয়া ওঠা বাগানেই। হারুৎ-মারুতের বিচার করলেন খোদা। তাদের সামনে দুটো অপশন রাখলেন। এক, দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন সব রকমের সুখ ভোগ করতে পারবে তারা। তবে মৃত্যুর পর অনন্ত নরকবাস হবে। আর যদি দুনিয়ায় শাস্তি ভোগ করে, তা হলে পরকালে ক্ষমা করে দেয়া হবে তাদের।

'প্রথমে তারা দুনিয়ার সব সুখ ভোগ করতে চেয়েছিল। পরে দেখবে আখেরাতে কী হয়। তবে এরপর ভেবেচিন্তে মত পাল্টে দুনিয়ায় দেয়া

শাস্তি মেনে নেয়। বিচারের পর তারা মানুষকে নিষ্ফল জাদুবিদ্যা শেখাতে লাগল। এভাবে পেরিয়ে গেল কয়েক বছর। এরপর তাদেরকে মাথা নিচে পা ওপরে করে ঝুলিয়ে রাখা হয় প্রথমে টাওয়ার অভ ব্যাবেলের দেয়ালে, পরে টাওয়ার ভেঙে গেলে আসমানে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ওভাবেই ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকবে তারা।

'তবে এটা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক জাদুবিদ্যা চর্চার প্রাথমিক পর্যায়। জাদু অনুশীলনের স্বর্ণযুগ ধরা হয় সোলেমান পয়গম্বরের আমলকে। সোলেমান পয়গম্বরের একটা অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আংটি ছিল। ওই আংটিতে খোদাই করা ছিল খোদার খুব গোপন এবং পবিত্র একটি নাম। ওটাই ছিল সোলেমান পয়গম্বরের সকল ক্ষমতার উৎস। হামামে গেলে কিংবা রমণী সম্ভোগের সময় আংটিটা হাত থেকে খুলে রাখতেন তিনি। একদিন হামামে যাওয়ার সময় আংটি খুলে চাকরানি আমিনার হাতে দিলেন। শয়তানের অনেক চেলার ভেতর একজনের নাম সেখার। এই সেখারকে দিয়ে সোলেমান নবী একবার একটা মূর্তি বানিয়ে নিয়েছিলেন। মূর্তিটা ছিল সিডনের এক প্রয়াত রাজার হুবহু প্রতিকৃতি। সোলেমান নবী সিডন আক্রমণ করে দখল করার পর সিডনের রাজাকে মেরে তার মেয়ে গেরাদেহ্-কে রক্ষিতা হিসেবে রেখে দেন। বাইবেলের ভাষ্যানুযায়ী এই পয়গম্বরের ছিল সাত শ' স্ত্রী আর তিন শ' রক্ষিতা। এইসব স্ত্রী আর রক্ষিতার অনেকেই যে যার বাপ-দাদার দেব-দেবীর পুজো করত। পুজো যাতে ঠিক মত হয়, সেজন্যে সোলেমান পয়গম্বর রাজপ্রাসাদ ঘিরে অনেকগুলো মন্দিরও বানিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও খোদার কাছে শির্ক সবচেয়ে বড় পাপ। পই-পই করে নিষেধ করা হয়েছে মূর্তিপুজো না করার জন্যে।

'যা হোক, এই গেরাদেহ্ ছিল পয়গম্বরের বিশেষ প্রিয় পাত্রী। তিনি দেখলেন গেরাদেহ্ রাতদিন তার বাবার জন্যে চোখের জল ফেলছে। মাঝে-মাঝে অবস্থা এমন হয় যে গেরাদেহ্র কান্নাকাটি আর থামতেই চায় না। মহাবিরক্ত হয়ে সেখার শয়তানকে ডেকে পয়গম্বর গেরাদেহ্র বাবার আদলে একটি মূর্তি বানাতে বললেন। মূর্তি তৈরি হলে পর ওটা স্থাপন করা হলো মন্দিরে। গেরাদেহ্ রাতদিন মূর্তিটার পুজো

করতে লাগল। মূর্তির পায়ের কাছে দিতে লাগল নৈবেদ্য। ঘটনার এখানেই শেষ না। অ্যামোনাইটদের রাজকুমারীকেও বিয়ে করেছিলেন এই পয়গম্বর। তো সেই রাজকুমারী পুজো করত দেবতা মোলকের। মোলক ছিল প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপদেবতা। এই অপদেবতার মাথা ছিল ষাঁড়ের; কাঁধ, হাত আর বুক মানুষের। পেট ভাঁটার চুলোর মত। এর মূর্তি গড়া হত উন্নত ব্রোঞ্জ আর নিরেট লোহা দিয়ে। তাকে তুষ্ট করার জন্যে দেয়া হত শিশুবলি। মূর্তির ভাঁটার মত পেটের ভেতর আগুন জ্বেলে গরম করা হত ওটাকে। আগুনের তাপে মূর্তিটা লাল গনগনে হয়ে উঠলে ওটার সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়া ধাতব হাতের উল্টো করে ধরা তালুর ওপর শুইয়ে দেয়া হত জীবন্ত শিশুকে। দেখতে দেখতে শিশুর ছোট্ট নশ্বর দেহ পুড়ে ঝামা হয়ে যেত। বাইবেলে উল্লেখ আছে, মোলককে অর্ঘ্য নিবেদন করার এমনি কোনও একটা দিনে পয়গম্বর নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু তাঁর অগুনতি স্ত্রী আর রক্ষিতারা নানান মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর পুজো করত, সেহেতু নিয়মিতই বিভিন্ন মন্দিরে তাঁকে দাওয়াত করা হত। এসব কর্মকাণ্ড ছাড়াও সোলেমান পয়গম্বরের নির্দেশে তাঁর ছেলে জেরোবোমকে হত্যা করা হয়েছিল। সোলেমানকে মুসলমানরা পয়গম্বর মনে করলেও ইহুদি, খ্রিস্টানরা করেন না। তাঁদের মতে সে সময় পয়গম্বর ছিলেন এহিয়া বা ইয়াহিয়া। এই ইয়াহিয়ার সঙ্গে জেরোবোমের খাতির ছিল। এসব নানা কারণে খোদা সোলেমান পয়গম্বরের ওপর রুষ্ট হলেন।

'আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পয়গম্বর হামামে গেলে এই সেখার পয়গম্বরের রূপ ধরে আমিনার কাছে গিয়ে আংটিটা নিয়ে নেয়। আমিনা বুঝতেই পারেনি আসল সোলেমান পয়গম্বর তখনও বাথরুমে। পয়গম্বর হামাম থেকে ফিরে আমিনার কাছে তাঁর আংটি চাইলে আমিনা আকাশ থেকে পড়ল। সে তো আংটিটা পয়গম্বরকে আগেই দিয়ে ফেলেছে! সোলেমান নবী বুঝে নিলেন, খোদা তাঁর ওপর নাখোশ। রাজপ্রাসাদে তাঁর আর জায়গা নেই। এরই ভেতর পয়গম্বরের রূপও বদলে গেল। চল্লিশ দিন ধরে

বন-বাদাড়ে ঘুরতে হয় তাঁকে। সেখার সেই সময় জেরুসালেমের যেসব লোক জাদুবিদ্যা শিখতে আগ্রহী, তাদের সবাইকে ডেকে বলল, সোলেমান পয়গম্বরের সিংহাসনের নিচে লুকানো একটা গহ্বর খুঁড়ে বার করতে। জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ, তার সবই লিখিত আকারে ওখানে রাখা ছিল। ওই লেখাগুলো ছাড়াও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন আংটির মাধ্যমে খোদা ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে বিষয়ে যেসব নির্দেশনা ফেরেশতাদের দিতেন, সেগুলোও সেখার জেনে ফেলতে লাগল। গোপনীয় সব তন্ত্র-মন্ত্রও নতুন করে বিষদভাবে লেখা হতে লাগল। পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে চল্লিশ দিন পর সোলেমান পয়গম্বর যখন নিজ বেশে প্রাসাদে ফিরলেন, তখন চারদিকে কালো-সাদা সব রকম জাদুর ধুন্ধুমার চলছে। এ যেন ওড়ে খই গোবিন্দায় নমঃ। খোদার দয়ায় সোলেমান পয়গম্বর তাঁর আংটি ফেরত পেলেন এবং কঠোর হাতে গোপন-প্রকাশ্য সব জাদু নিষিদ্ধ করলেন। বিধান দিলেন জাদুর চর্চা যারা করবে, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন এ সংক্রান্ত সব পুঁথি-পত্র যেখানে যা ছিল। এরপর তাঁর নির্দেশে আবারও নতুন করে জাদুমন্ত্রের বই লেখা শুরু হলো। আবার এই যন্ত্রণা নতুন করে কেন করতে গেলেন, সেইটে পয়গম্বরই ভাল বলতে পারবেন। যা হোক, সব কিছু লেখা হলে, তাঁর নির্দেশে লোহার একটা বাক্সে বইগুলো ভরে ফের তাঁর সিংহাসনের নিচে গোপন এক খোঁদলের ভেতর রাখা হয়। ধরা হয় তাঁর মৃত্যুর পর যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়, সেই সময় কালো জাদুর চর্চাকারীরা বইগুলো আবারও খোঁদল থেকে বের করে নেয়।

'কালো জাদু-চর্চার এই হলো শুরু। এরপর আর সেটা থেমে থাকেনি। তবে আগে যা ছিল প্রকাশ্য, এখন তা হয়ে গেল গোপনীয়। পুরনো সভ্যতা যেসব দেশে ছিল, সেগুলোর প্রায় সব জায়গাতেই হারুৎ-মারুতের উল্লেখ আছে। প্রাচীন আর্মেনিয়ায় হরোত-মরোত নামে দুই সহযোগী দেবতা ছিল। পারস্যেও এদের পুজো করা হত। এদের নাম ছিল হরভাত আর আমেরতাত। বহুকাল আগে ফেরাউনের সাম্রাজ্যে প্রধান দুই জাদুকর ছিল জ্যানেস ও

জ্যাম্ব্রেস। ধারণা করা হয় মূসা নবীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছিল এদেরই। হারুৎ-মারুৎই এই জ্যানেস এবং জ্যাম্ব্রেস।'

এতক্ষণ চুপচাপ মৃণাল বাবুর লেকচার শুনে যাচ্ছিল অমল। ভেতরে ভেতরে বিরক্ত। বাবু কিছুটা পজ দিতেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জাদু শেখার কী হলো সেইটে তো বললেন না।'

'সে প্রসঙ্গে আসছি। কুকুরের ছবি আঁকতে গিয়ে দেখলাম আমার আঁকার হাত ভাল। বাবা ড্রয়িং মাস্টার রেখে দিলেন। চারুকলার শেষ বর্ষের এক ছাত্র। নাম হিমেল ভট্টাচার্য। এই হিমেলের কাজ ছিল হিন্দু পুরাণে যেসব কাহিনি আছে, সেগুলোর চিত্রায়ণ করা। যেমন রেনেসান্স যুগে ইতালির নামকরা শিল্পীরা বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছবি আঁকত। ছবি আঁকতে হলে যে ঘটনার ওপর ভিত্তি করে ওটা আঁকা হবে, সেটা খুব ভাল করে জানতে হয়, কিংবা পড়ে নিতে হয়। গুরু যা করে, শিষ্যকেও সেটাই কম-বেশি করতে হয়। হিন্দু পুরাণে বগ্লামুখী নামে এক দেবীর উল্লেখ আছে। এ এক বিচিত্র দেবী। যত ধরনের তন্ত্র-সাধনা আর কালো জাদু আছে, সেগুলোর প্রায় সবটাই এই দেবীর নিয়ন্ত্রণে। এর সব কিছু হলুদ রঙের, এমন কী যে পদ্মফুলের ওপর দেবী অধিষ্ঠিত, সেটাও। পদ্মফুল যে হ্রদে ভাসছে সেই জলও হলুদ। এই কারণে এর নাম হয়েছে পীতাম্বর মা। বগ্লামুখীর আসল নাম বল্গামুখী। সোজা বাংলায় ঘোড়ার লাগামপরা মুখ। প্রাগৈতিহাসিক কালে শিবের পিঠ থেকে জন্মানোর পর হলুদ সরোবর থেকে উঠে আসে এই দেবী। একবার মহাজাগতিক এক কৃষ্ণ-ঝড়ের কবলে পড়ে ভগবানের সব সৃষ্টি লাটে উঠে যাচ্ছিল। তখন বগ্লামুখী এসে পৃথিবীকে চিরতরে লুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল। আলো-আঁধার, শব্দ-নৈঃশব্দ, আধ্যাত্মিক-পৈশাচিক আর ভাল-মন্দের বর্ডার লাইনে এর অবস্থান। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর ভেতর এর সঙ্গে মিল আছে শুধু মাত্র ছিন্ন-মস্তার। এই ছিন্ন-মস্তা দেবী কালীর দশ রূপের একটা। খুবই রহস্যময় এই ছিন্ন-মস্তা।

'পুরাণের অনেক বর্ণনা-টর্ননা পড়ে হিমেল স্যর ছিন্ন-মস্তার ছবি এঁকেছিলেন। ওই ছবি একবার দেখলে যে-কারও সারাজীবন মনে

থাকবে। ছবিটা ছিল এরকম: দেবীর বাঁ হাতে পিশাচের জিভ, ডান হাতে শাল কাঠের শক্ত লাঠি। ছিন্ন-মস্তা নিজেই নিজের মাথা কেটে এক হাতে ধরে রেখেছে। অন্য হাতে সাপের জিভের মত দুই-মাথাঅলা খঞ্জর। কাটা গলা থেকে তিনটি ধারায় ঝরনার মত রক্ত বেরিয়ে আসছে। দেবীর দুই পাশে দাঁড়ানো দুই পিশাচী। কাটা মাথা আর দুই পিশাচিনী পান করছে সেই রক্ত। দেবী দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গমরত এক যুবক-যুবতীর ওপর। যৌনাঙ্গ-বিদ্ধাবস্থায় এলো চুলে পায়ে নূপুর পরা সম্পূর্ণ নগ্ন, ফর্সা ধবধবে স্বাস্থ্যবতী যুবতী ওপরে, মাথায় মুকুট আর হাতে বাজুবন্ধ পরা কালো কুচকুচে দিগম্বর যুবক নিচে। যুবক ধরেছে যুবতীর সুডৌল স্তন, যুবতী যুবকের গলা। এরা সঙ্গম করছে এক ত্রিভুজের ভেতর। ত্রিভুজটা আঁকা হয়েছে একটা বৃত্তের মধ্যে। বৃত্তটা আবার সাদা-গোলাপি ইয়া বড় একটা পদ্মফুলের ওপর আঁকা। পিশাচীদের একজন ধবধবে সাদা, অন্যজন ঘোর কৃষ্ণকায়। এদের মাথার উপর আকাশে উড়ছে দুটো-দুটো করে চারটে শকুনি। দেবী এবং পিশাচীদের গলায় নরমুণ্ডের মালা। পিশাচীদের এক হাতে সাদা মাটির গামলা, অন্য হাতে দুই মাথাঅলা খঞ্জর। দেবী বা পিশাচী পুরোপুরি নগ্ন। রক্তে মাখামাখি দেবীর বুক-পেট। সেই রক্ত উরুসন্ধি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে টপটপ করে। পুরো ব্যাপারটিই ঘটছে কৃষ্ণপক্ষের মাঝরাতে একটা শশ্মান ঘাটে।

'স্যরের আঁকা বগ্লামুখী আর ছিন্ন-মস্তার ছবি দেখার পর এদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ হলো। মনে হলো জাদুবিদ্যা শিখতে হলে এদের অনুগ্রহ অবশ্যই দরকার। এই দেবীদের ব্যাপারে যেখানে যা লেখা আছে, পড়তে শুরু করলাম। অর্থাৎ, কীভাবে এদের আরাধনা করা যায়, সেইটে জানা। বগ্লামুখীর নিজস্ব মন্দির নেই বললেই চলে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে আদ্যিকালের এক মন্দির কমপ্লেক্সে ছোট্ট একটা অংশে এই দেবীর অধিষ্ঠান। ছিন্ন-মস্তার মন্দিরেরও ওই একই অবস্থা। আসামের গোহাটির কামাখ্যা মন্দিরে ছিন্ন-মস্তার সাধনপীঠ। তখন পাকিস্তান আমল। বাবা আমার পীড়াপীড়িতে রাজি হলেও কর্ণাটক কিংবা আসামের গোহাটিতে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর আমার ইচ্ছে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় ভর্তি হওয়ার। বাবা রাজি হলেন না। তাঁর ইচ্ছে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। সাবজেক্টের ব্যাপারে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। আমি ভর্তি হলাম টুলেন ইউনিভার্সিটিতে। পরদাদার আমলের তৈরি দু' শ' বছরের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়। সাবজেক্ট, ডিসিপ্লিনের অভাব নেই। প্রথম সেমেস্টার ফাইন আর্টসে ক্লাস করলাম। দ্বিতীয় সেমেস্টারে উঠে ডিসিপ্লিন বদলে ভর্তি হলাম কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান স্টাডিজে। এর পেছনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে। নিউ অর্লিন্সের আবহাওয়া বাংলাদেশের মতই। তবে ডিসেম্বরের শেষ দিকে মাঝে-মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়। আমার ক্লাস শুরু হয়েছিল অগাস্টের শেষে। ডিসেম্বরের শেষ দিকে সেমেস্টার ফাইনাল পরীক্ষা। শুরু হবে ক্রিসমাস আর নিউ ইয়ারের ছুটি। একদিন শুক্রবারে দুপুর বারোটা থেকে চার ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়ে ডর্মে ফিরছি। ভাবলাম ক্যাফেটেরিয়া থেকে এক কাপ কফি কিনে খাই। যে বিল্ডিং-এ ক্যাফে, সেখানে গিয়ে দেখি রড-লাইটের আলোয় হাহা করছে ক্যাফে। একটা লোকও নেই। শুক্রবার বলে কথা। উইক-এণ্ড শুরু। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে আবার যখন রাস্তায় নামলাম, তখন কড়কড় বাজ পড়ছে। শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি। এ কালবৈশাখীর বাবা। আঁধার হয়ে এল চারদিক। যেন সূর্য-গ্রহণ চলছে। চার শ' বছরের প্রাচীন শহর নিউ অর্লিন্স। কবল-স্টোন রাস্তা, অসংখ্য গলিঘুপচি। বাড়ি-ঘর ওই চার শ' বছর আগে যেমন ছিল, এখনও বলতে গেলে তেমনিই আছে। ভাঙা হয়নি কিছুই। যখন যতটুকু দরকার মেরামত করেই চালানো হচ্ছে।

'আমেরিকানদের কাছে নিউ অর্লিন্স ভূত-পিশাচদের শহর। এখানকার মোড়ে মোড়ে উইচক্র্যাফ্‌ট্ বা ডাকিনী বিদ্যার চর্চা হয়। গভীর রাতে চলে পিশাচ সাধনা। ওখানকার শহরগুলোতে ধুলো-বালি নেই। তারপরেও বাতাসের তোড়ে চোখ খোলাই যাচ্ছে না। মূল রাস্তা বিরাট চওড়া। কিন্তু হলে কী হবে, রাস্তা

পেরোলেই মিসিসিপি নদী। চওড়ায় পদ্মার সমান। কূলের কাছেই কলকল করছে জল। এই রকম ঝড়ের সময় নদীতে বান ডাকে। তখন ওদিকে যাওয়া মানা। মার্ক টোয়েনের সব বইয়ে এই নদীর ভয়াবহতার কথা আছে। বড় রাস্তা ছেড়ে ঢুকলাম গলির ভেতর। মাথা নিচু করে দৌড়াচ্ছি। কোন্‌দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছি কিচ্ছু জানি না। তখন পর্যন্ত ওই শহরের কিছুই চিনি না। যা হোক, গলির ভেতর ঝড়ের তাণ্ডব কম। ভিজে সপসপ করছে সারা গা। কোনও এক জায়গায় না থামলেই নয়। হঠাৎ সামনে দেখলাম লোহার খুঁটিঅলা চওড়া বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে কাঁচের জানালা-দরজা। ভেতরে আলো জ্বলছে। কোনও কিছু না ভেবেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। বুঝতে পারলাম, ওটা একটা উন্নতমানের পাব। বাইরে এত যে প্রলয়কাণ্ড অথচ ভেতরে মহাশ্মশান। না কোনও শব্দ, না কোনও বাতাস। একদিকে চওড়া কাউন্টারঅলা বার, অন্যদিকে সাদা টেবলক্লথে ঢাকা চারজন বসার জন্যে ছোট-ছোট ডায়মণ্ড শেপ্‌ড টেবিল। প্রায় পনেরো-বিশজনের মত লোক বসে আছে টেবিলগুলো ঘিরে। স্যুট-টাই পরা মাঝবয়সী এক লোক ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে রোস্ট্রামের পেছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওভারহেড ল্যাম্পের আলোয় বক্তা এবং বারই শুধু আলোকিত। হলের বাকিটা প্রায় আঁধার। খুবই কমন দৃশ্য। শহরের এখানে সেখানে এরকম অনেক পাব আছে। বিতর্কিত সব বিষয় নিয়ে পণ্ডিতেরা এসব জায়গায় লেকচার দেন। বাছাই করা কিছু অডিয়েন্সই শুধু এ ধরনের লেকচার শুনতে আসে। অডিয়েন্সের পেছন দিকে বাথরুম। সেখানে গিয়ে গা-মাথা মুছে পেছন দিকের একটা চেয়ারে বসলাম। দর্শক ডিঙিয়ে বারে গিয়ে ড্রিঙ্ক আনার সাহসই হলো না। লেকচার হচ্ছে প্রাচীন কালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ধর্ম নিয়ে। সেকালে ধর্ম আর জাদুর ভেতর পার্থক্য ছিল না বললেই চলে। শেষদিকে লেকচার চলে গেল কালো জাদুর রিচুয়ালিস্টিক দিকগুলোতে। পশ্চিমা দেশের পণ্ডিতদের অন্যতম গুণ হলো, যে বিষয় নিয়ে তারা পড়াশোনা করে, সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান হয় অসাধারণ। ফাঁকিযোগী কিংবা জোড়াতালির দৃষ্টান্ত বিরল। লেকচার যা হলো,

তার বেশিরভাগই বুঝতে পারলাম না। তবে যেটুকু বুঝলাম, মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাতেই।

'এই অধ্যাপকের নাম সিরাস ইসকারিয়াত। কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান ডিসিপ্লিনের ফ্যাকাল্টি। ভদ্রলোকের ভক্ত হয়ে গেলাম। তাঁরই পরামর্শে বদলালাম ডিসিপ্লিন। তিন বছর পড়ার পর শুরু হলো গবেষণা। বিষয়: ক্লাসিক্যাল যুগের ধর্ম। ল্যাটিন এবং পুরনো গ্রীক ভাষা আগেই শিখতে হয়েছে। অধ্যাপক বললেন অ্যারামিক ভাষাটাও রপ্ত করতে। দু'হাজার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এই ভাষা দারুণ কঠিন। এ হলো যিশু খ্রিস্ট যে ভাষায় কথা বলতেন, সেই ভাষা। অধ্যাপককে বললাম, অ্যারামিক শেখা আমাকে দিয়ে হবে না। ভদ্রলোক তখন আমাকে একটা শর্ত দিলেন। বললেন, ওই ভাষা না শিখেও গবেষণা যাতে চালাতে পারি সেইটে তিনি দেখবেন, তবে তার বিনিময়ে তাঁকে বিশেষ কাজে সহায়তা করতে হবে। ভদ্রলোক ব্ল্যাক আর্টের চর্চা করতেন। হাতে-কলমে কৃষ্ণ-জাদু চর্চার এই হলো শুরু। অসম্ভব জ্ঞানী সিরাস, সেই সঙ্গে ভীষণ ধূর্ত। আমার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। প্রয়োজন ছিল আমাকে শুধু বাজিয়ে নেয়ার। তার জন্যে তিন বছর যথেষ্ট সময়। নিউ অর্লিন্সে ভুডুর চর্চা ব্যাপক। দু' শ' বছর আগে মেরি লেভো নামে এক আধা-ফরাসি আধা-আমেরিকান মহিলা ভুডুর কর্ণধার হয়ে দাঁড়ায়। এঁ এত বিখ্যাত ছিল যে, একে আজও ভুডু কুইন বলা হয়। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম প্রফেসর আমাকে এইসব কর্মকাণ্ডের ভেতর জড়াবেন। পরে বুঝতে পারি, ভুডু অনেক নিচু স্তরের আফ্রিকান ব্ল্যাক আর্ট। অশিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত লোকজন ভুডু নিয়ে মাতামাতি করে। বাণ মারা এবং পছন্দের রমণী হাসিল করাতেই ভুডু সীমাবদ্ধ। এর থেকে বেশি কিছু ভুডু থেকে পাওয়া সম্ভব না।

'সিরাস যেটা করতেন সেটা হলো হাজার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া আসল ব্ল্যাক আর্টের অনুশীলন। তিনি নৈবেদ্য দিতেন দেবী হেকাটি এবং পিশাচ লিওনার্দ-কে। বহুকাল আগে তুরস্কের দক্ষিণে লিজিয়া নামে এক জায়গা ছিল। হাজারে হাজারে খোজা বা নপুংসক ক্রীতদাস বাস করত ওখানে। নানান জায়গা থেকে সক্ষম

যুবকদের ধরে লিজিয়ায় এনে তাদেরকে নৃশংসভাবে খোজা করে দেয়া হত। বাধ্য করা হত চিরকালের জন্যে নপুংসকের জীবন বেছে নিতে। এইসব যুবকের কান্না আর অভিশাপে ভারী হয়ে থাকত লিজিয়ার আকাশ। এই খোজারাই প্রথম দেবী হেকাটির মন্দির তৈরি করে। হেকাটি জাদুমন্ত্র আর ডাকিনী বিদ্যার একচ্ছত্র মালকিন। এর জন্যই হয়েছে কৃষ্ণ-জাদুর চর্চা যারা করে, তাদের সাহায্য করার জন্যে। লিজিয়ার খোজারা বিশ্বাস করত, হেকাটিকে তুষ্ট করতে পারলে যৌন ক্ষমতা ফিরে পাওয়া যাবে। না-পাওয়া গেলেও দেবী অন্যভাবে যৌন-সম্ভোগের আনন্দ পাইয়ে দেবে। এর আরাধনার শুরুটা খোজারা করলেও পরে সক্ষম-অক্ষম, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবাই পুজো দিতে শুরু করে। উদ্দেশ্য দীর্ঘ জীবন ও অঢেল সম্পদ লাভ। এর তিন শ' বছর পরে হেকাটির মন্দির ছড়িয়ে পড়ে মেডিটেরিনিয়ানের দক্ষিণে সবগুলো দেশে, পুবে সিরিয়া থেকে পশ্চিমে কার্থেজ অর্থাৎ লিবিয়া পর্যন্ত। এবং এই কাজটার কৃতিত্ব দিতে হবে ব্যাকট্রিয়া বা সেন্ট্রাল এশিয়ার সম্রাট আগাথোক্লিসকে। আগা নামটা এর কাছ থেকেই এসেছে। সে আর এক কাহিনি। অন্যদিন বলব।

'তবে সিরাস এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি লিওনার্দকেও খুশি করার চেষ্টা করতেন। লিওনার্দের পুজো বেশিরভাগই জার্মানিতে হয়। এ পিশাচ ওখানকার ডাইনীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যত উইচক্র্যাফট্—সব এ-ই শিক্ষা দেয়। এর আরাধনা হয় লোকালয় থেকে দূরে সিডার আর ওক বনের ভেতর ঘাসে ঢাকা বৃত্তাকার খালি জায়গা বা ক্লেয়ারিঙে মোষের শিঙের মত বাঁকা চাঁদের রাতে। লিওনার্দের দেহ মানুষের, মুখ-মাথা তিন শিংঅলা ছাগলের। লিওনার্দের পেছনদিকে গুহ্যদ্বারে মানুষের মুখের মত মুখ আছে। পূজারীদের ডাকে সাড়া দিয়ে বনের ভেতর আবির্ভূত হলে লিওনার্দ প্রথমে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। ডাইনীদের তখন তার নিতম্বের ভেতর চুমু দিয়ে তাকে তুষ্ট করার কর্মকাণ্ড শুরু করতে হয়। ওয়ারউল্ফ কিংবা ভ্যাম্পায়ার হতে হলেও এর আশীর্বাদ দরকার। প্রিন্স ভ্লাদ বা ড্রাকুলাও এর পুজো করত। লিওনার্দের পুজোর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে অবাধ যৌন মিলন।

সব ডাইনীকেই এর ডাকে সাড়া দিতে হয়। লিওনার্দ ভোগ করার পরেই কেবল তার পুরুষ অনুসারীরা পুজোর জায়গায় ডাইনীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। তবে নারী সম্ভোগের জন্যে লিওনার্দকে মানুষের দেহ ধারণ করতে হয়। এই দেহ হতে হয় এমন একজন যুবকের, যে আগে কখনও নারী সঙ্গম করেনি। লিওনার্দের অনুসারীরা এ ধরনের একজন যুবককে ধরে এনে প্রথমে তাকে ধুতুরার বিষ খাওয়ায়। তারপর লিওনার্দের মূর্তির সামনে ওই তরুণকে নী-ডাউনের ভঙ্গিতে তার হাঁটুর ওপর দাঁড় করায়। এরপর পেছন থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলে। লিওনার্দ তখন এই মৃতের শরীরে ঢোকে। মৃত যুবকের দেহে বীর্যের শেষ বিন্দু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত লিওনার্দ একের পর এক নারী সম্ভোগ করতেই থাকে। এই যৌন মিলনের ফলে কোনও কোনও নারী গর্ভধারণও করে। কিন্তু প্রসব করার পর দেখা যায় সন্তান মৃত। তবে ডাকিনী বিদ্যার চর্চা যারা করে, তাদের কাছে এই মৃত শিশুর লাশ এক অমূল্য জিনিস।

'সিরাস লিওনার্দের পুজো করতেন তার যৌন-লালসা নিবারণের জন্যে। সিরাসের অধ্যাপনা ছিল আসলে লোক দেখানো। নিউ অর্লিন্সের সেরা ধনী এই লোক। তাঁর নামে কোটি কোটি ডলারের অফশোর অ্যাকাউন্ট। দারুণ বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতেন ভদ্রলোক। তবে সবই চলত আড়ালে আবডালে। তাঁর শিকার হত টিন এজার আর কুমারী মেয়েরা। লাখ-লাখ ডলার খরচা হলেও সিরাস নিয়মিত এদের বিছানায় তুলবেনই। আগেই বলেছি, সিরাস ছিলেন ধূর্ত শিরোমণি। তাঁর নীতি হলো একলা চলো রে। অবশ্য তাঁর অধ্যাপনার আরও একটা কারণ ছিল। কালো জাদুর চর্চা এক চলমান প্রক্রিয়া। যত বেশি গবেষণা তত বেশি উন্নতি। রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ছাড়া দুনিয়া অচল।'

ফাঁক পেয়ে অমল আবার বলল, 'কিছু মনে করবেন না, স্যর। সিরাসের নীতি যদি একলা চলো রে-ই হবে, তা হলে আপনাকেই বা নিলেন কেন? আর নেবেনই যদি, তো আপনি ছাড়া আরও লোক ছিল না?

'অতীতে হয়তো সাহায্যকারী কেউ ছিল।

আমার সঠিক জানা নেই। তবে আমাকে বেছে নেয়ার পেছনে প্রধান কারণ ছিল আমার অদম্য আগ্রহ এবং আমি ভিন দেশি। ওদেশে আমার কেউ নেই। বিদেশি ছাত্র যদি দুই-দশটা নিখোঁজও হয়, তবুও কেউ কেয়ার করবে না। তখন বাংলাদেশ কেবল স্বাধীন হয়েছে। সব কিছু এলোমেলো। ওদেশে গিয়েছিলাম পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে। আমি আসলে কোন্ দেশের সেটারই ঠিক নেই। সিরাস এসব জানতেন। আমার চেয়ে উত্তম সহযোগী আর কোথায় পাবেন তিনি? যা হোক, পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সিরাসের প্রধান উপাস্য ছিল দেবী হেকাটি। এর মূর্তির দু'দিকে দুই পিশাচী। মাথায় মোষের শিঙের মত অর্ধেক চাঁদ। চাঁদের ভেতর ছয় কোণের একটি তারা। দেবীর এক হাতে মশাল, অন্যহাতে চাবি, দাঁড়িয়ে আছে তিন রাস্তার মোড়ে। চাবি হলো সম্পদের প্রতীক, মশাল জীবনের। এর আরাধনা করতে হয় ঘোড়া আর কুকুর বলি দিয়ে। শর্ত হলো পুজোর সব আয়োজন করতে হবে তিন রাস্তার মোড়ে রাতদুপুরে। একজনের পক্ষে সব কিছু সম্ভব না। একাজে কমপক্ষে দু'জন লাগবে। যে মূর্তির সামনে বলি চড়ানো হবে, সেইটে হতে হবে অতি প্রাচীন। তারপর দরকার জটিল সব মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে বহু কাল আগেই।'

'আপনি সিরাসকে সাহায্য করেছিলেন?'

'তা তো বটেই।'

'ব্যাপারটি খুলে বলবেন?'

'আজ এ পর্যন্তই। এর বেশি কিছু জানার আপনার দরকার নেই। এই ভূমিকাটুকু না জানলে পরের কাজগুলোর গুরুত্ব আপনি বুঝতে পারবেন না। ওটাই এতকিছু বলার কারণ। আজকের মত বাসায় ফিরে রেস্ট নেন। কাল

আসবেন।'

অমল লক্ষ করল কথা বলতে বলতে ঘেমে নেয়ে গেছে মৃণাল বাবু। নেতিয়ে পড়েছে সোফার ওপর। মেসের দিকে রওনা হলো অমল। গুলিস্তানের ছোট পার্কে বসবে কি না ভাবছে। রেখা মেয়েটার কথা মনে পড়ছে খুব। কিন্তু সমস্যাও আছে। কামাল দেখে ফেলতে পারে। তিনে তিনে ছয় মেলাতে তার তখন সময় লাগবে মাত্র এক সেকেণ্ড। সাত-পাঁচ ভেবে মেসে ফিরে গেল অমল। মেসে ফিরতেই অমলের হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিলেন বিনয় বোস। পৃথিবীতে কিছু লোক আছে, যারা সব কিছুতে শুধু খারাপটাই দেখতে পায়। বোস বাবু যে দৃষ্টিতে অমলের দিকে তাকালেন, সেই দৃষ্টির ভাষা এমন: নিজেই খেতে পাস না। এখন দেখ তোর বাড়িতে কী ছুঁচোর নেত্য হচ্ছে। চিঠি খুলে পড়। তারপর বুঝবি কত পাটে কত দড়ি। যত্ত সব ফকির মিসকিনের দল।

রুমে গিয়ে চিঠি পড়ে অমলের চোয়াল ঝুলে পড়ল। তাদের জ্যাঠা মশাই মানিকগঞ্জ কোর্টে কেস করেছেন। ঠাকুরদা নাকি মৃত্যুর আগে অমলদের বাড়ি সহ চার বিঘে জমি জ্যাঠার নামে লিখে দিয়ে গেছেন। রেজিস্ট্রি করা আমমোক্তারনামা আছে। অমলদের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে মামলা রুজু করেছেন জ্যাঠা। আপাতত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে। সাত দিনের ভেতর জবাব দাখিল করতে হবে। না হলে একতরফা রায় হয়ে যাবে। নিষেধাজ্ঞার মামলায় নানান ফ্যাঁকড়া থাকে। এ হলো সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক। লোয়ার কোর্ট, জজ কোর্ট, হাই কোর্ট করে যদি বা অস্থায়ী নাকচ করা যায়, তারপরও স্থায়ী থাকে। আবারও সেই সিঁড়ি-ভাঙা। জলের মত টাকা খরচ, এস্তার দৌড়াদৌড়ি। কিন্তু তার বিনিময়ে প্রাপ্তি যৎসামান্য। ওদিকে ছেড়ে দিয়ে

বসেও থাকা যাবে না। নইলে ভিটে-মাটিছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। দুঃসংবাদের এখানেই শেষ নয়। অমলের ছোট ভাই বিমল ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে বাড়ির পেছনে ব্রয়লার মুরগির খামার করেছিল। সেই সময় আশপাশের অনেকেই ব্রয়লার চাষ করে দু'পয়সা কামাচ্ছিল। মাস ছয়েক আগে বার্ড ফ্লু না কী একটা ভাইরাসে সব মুরগি সাবাড়। কেউ-কেউ মুরগি বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং বলা যায় প্রায় সফলও হয়েছিল, কিন্তু সরকার ওসব কেয়ারই করেনি। যেখানে যা মুরগি ছিল, পুলিশ আর ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে সব মেরে গর্তে ফেলে পুড়িয়ে ছাই করেছে। এখন ক্ষুদ্র ঋণঅলারা সুদ সহ বকেয়া ফেরত চাচ্ছে। এক লাখের ভেতর বিমল পঞ্চাশ শোধ করেছিল। এখনও পঞ্চাশ বাকি। সুদের যে হার, তাতে সুদ যে কত হয়েছে তা ভগবান জানেন! ওদিকে মায়ের ডায়াবেটিস, শ্যামলের (বিমলের ছোট) হার্নিয়া অপারেশন! দুপুরে কোনও কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল অমল। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। চোখ খুলে রাখার শক্তিটাও নেই।

পরদিন ভোরে উঠে নাস্তা সেরে হেঁটে হেঁটে তার 'অফিসে' গেল অমল। আসার পথে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা করেছে সে। বাড়ি যাওয়া দরকার। জ্যাঠার সঙ্গে কোনও রফা করা যায় কি না, দেখতে হবে। জমি-জাতি বেচে অন্তত ঋণটা শোধ করা প্রয়োজন।

ঠিক ন'টায় গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অমল। দারোয়ান বলল, 'মেম সা'ব কা অফিস মে যাইয়ে।'

মন্দাকিনীর সঙ্গে দেখা হতেই একতাড়া ফর্ম এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ক্রস মার্ক করা জায়গাগুলোতে আপনার সই লাগবে। ওগুলো নিয়ে স্যারের কাছে যান। ওঁর সঙ্গে কথা বলে তারপর সই করবেন।'

বড় হলঘরটাতে মৃণাল বাবু আগের মতই সোফায় বসা। অমলকে ইশারায় বসতে বলল।

'অমল বাবু, আপনাকে খুব মনমরা দেখাচ্ছে। বাড়ির সব খবর ভাল তো?'

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল অমল। লোকটা ভয়ানক বুদ্ধিমান। সব সমস্যা ঝেড়ে-

ঝুড়ে বলার এখনই সময়। মৃণাল বাবুকে সব কিছু খুলে বলল সে। মৃণাল বাবু বলল, 'আমার তো মনে হয় আপাতত লাখ দুয়েক টাকা হলেই চলবে। আপনি চাইলে টাকাটা নিতে পারেন। তবে শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'আমি যা যা বলব, আপনাকে সেইমত কাজ করতে হবে।'

'আপনার কথা মতই তো কাজ করছি। নতুন করে আবার কী কাজ করতে হবে?'

'পুরো বিষয়টা আপনাকে এখনও বলা হয়নি। সব কিছু শুনে চিন্তা-ভাবনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। একবার রাজি হলে আর পিছাতে পারবেন না।'

'খুন-খারাবির ভেতর আমি নেই। অন্য কিছু করতে বললে ভেবে দেখতে পারি।'

'আরে নাহ্। এসব কিছু না।'

'আচ্ছা, বলেন, কী আপনার শর্ত?'

'আপনার জীবন থেকে কিছুটা আয়ু আমাকে দিয়ে দিতে হবে।'

'এ আবার কী শর্ত! আয়ু আবার ধার দেয়া যায় নাকি?'

'হয়তো যায়, হয়তো যায় না। না গেলে নাই। আর যদি যায়, তা হলে আপনি দেবেন কি না?'

'এ তো মনে হচ্ছে পাগলের শর্ত।'

'বাবু, আপনি রাজি আছেন কি না সেইটে বলেন। পাগলের শর্ত, না ইন্টেলেকচুয়ালের কণ্ডিশন সেটা শর্ত যে দিচ্ছে তাকে বুঝতে দেন।'

'ঠিক আছে, শর্ত মানতে রাজি আছি আমি। কয় বছরের আয়ু ধার দিতে হবে?'

'ধার না। একেবারে দিয়ে দিতে হবে। নন-রিফাণ্ডেবল।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু কয় বছরের?'

'দশ বছরের।'

'বেশ, তা না হয় হলো। কিন্তু আমার দশ বছরের-আয়ু কার দরকার? আর নেবেই যখন আরও বেশি করে নিচ্ছে না কেন? দশ বছর খুব বেশি সময় তো না।'

'আপনার আয়ু আপনি দেবেন আমাকে।'

এবার অমল সত্যিই অবাক হলো। মৃণাল বাবুকে খুব হাই লেভেলের পাগল বলে মনে

হচ্ছে। এদেরকে ঠিক পাগল বলা যায় না। এরা হচ্ছে ম্যানিয়াক। কোনও তত্ত্ব একবার যদি বিশ্বাস এরা করেছে, তা হলে যত অসম্ভব আর অযৌক্তিকই সেটা হোক না কেন, সেখান থেকে তাদের ফেরানো যাবে না কিছুতেই। মন্ত্রের সাধন, না হয় শরীর পাতন। এরা হচ্ছে এই গোত্রের।

'অমল বাবু, আপনি কী ভাবছেন আমি জানি। ধরে নেন আমি পাগল কিংবা ম্যানিয়াক। তাতে আপনার অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না। ভেবে দেখেন, টাকার জন্যে মানুষ রক্ত, চোখ, কিডনি, দেহ, কত কিছু বিক্রি করছে। জীবন সংশয় হচ্ছে। আপনি শুধু বিক্রি করছেন আয়ু। তা-ও দশ বছরের। যত টাকা আপনার দরকার, সেটা শুধু কিডনি বিক্রি করলেই জোগাড় হতে পারে। কিডনি বিক্রি করলে অপারেশন থিয়েটারেই মারা যেতে পারেন। সেখানে না মরলেও পরে যে-কোনও সময় মরতে পারেন।'

'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমার আয়ু আদৌ দশ বছর আছে কি না, সেটাই বা কীভাবে জানা যাবে? যে-কোনও সময়ই যে কেউ মরতে পারে।'

'স্বীকার করছি সেই ঝুঁকি আছে। তবে ক্যালকুলেটেড রিস্ক বলে একটা কথা আছে। আপনার ঠিকুজি-কুলজি নিয়ে গত দু'মাস গবেষণা করেছি। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া কাকতালীয় নয়। তারপরেও যেটুকু সন্দেহ ছিল, চাকরির দরখাস্তে আপনি যে তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে দূর হয়েছে।'

'আপনি তা হলে পার্কে যেতেন আমাকে খুঁজতে! মাথা বানানো, ধাঁধা জিজ্ঞেস করা স্রেফ অজুহাত?'

'বিষয়টা সেই রকমই। তবে সেই লোক যে আপনিই হবেন, তা জানতাম না। গ্রহ-নক্ষত্রের বিচারে যাকে দিয়ে কাজ হবে, সেই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার সব থেকে বেশি সম্ভাবনা ছিল ওখানটাতেই, বছরের এই সময়ে, জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি। দরকার ছিল লক্ষণ আর গুণ বিচারের। ধাঁধা জিজ্ঞেস করে গুণ বিচার করা অতি পুরনো গ্রিক রীতি। এডিপাস আর স্ফিংসের ঘটনাটা মনে করে দেখেন। এসবই আমার গুরু সিরাসের কাছ থেকে শেখা। তবে আশ্চর্যের

বিষয় কী জানেন? আপনিও জাতে হিন্দু এবং আমাদের বংশের লোক। বহুকাল আগে আমার-আপনার একই পরিবার ছিল।'

'বুঝলাম, আমরা একই বংশের, মান্ধাতার আমলে পরিবারও একটাই ছিল, কিন্তু কী লাভ হচ্ছে?'

'আপনি বাবর আর হুমায়ুনের ঘটনা তো জানেন। ছোট বয়সে হুমায়ুন মরতে বসেছিল। সে যখন সব চিকিৎসার বাইরে, আজরাইল কখন আসে সেই অপেক্ষায়, তখন এক সুফি সাধক বাবরকে বললেন হুমায়ুনের জীবন বাঁচাতে হলে তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিস, সেইটে কুরবানি করতে হবে। বাবরের মহামূল্যবান জিনিস মাত্র তিনটি: কোহিনূর হীরে–যেটা তিনি ইতিমধ্যে হুমায়ুনকে দিয়ে দিয়েছেন, তাঁর রাজ্যপাট, এবং নিজের জীবন। বাবর ভেবে দেখলেন শেষেরটির মূল্যই সব থেকে বেশি। কুরবানি করতে হলে ওটাকেই করতে হবে। সুফির নির্দেশে বাবর হুমায়ুনের খাটের চারদিকে তিন পাক ঘুরলেন। ঘোরার সময় মনে-মনে বললেন, হে, করুণাময়, আপনি আমার আয়ু, আমার জীবন আমার ছেলেকে দিয়ে দিন এবং তার অসুখ আর মৃত্যু আমাকে দিন। বাবর এই কাজ করলেন মাগরেবের আযানের সময়। পরদিন ফজরের পর থেকেই হুমায়ুন সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বাবর আর বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। তাঁর সব আয়ু তিনি হুমায়ুনকে দিয়ে ফেলেছেন। আত্মীয়তার টান অনেক বড় জিনিস রে, ভাই।'

'তা না হয় হলো। কিন্তু আপনি তো হুমায়ুন না, আমিও বাবর না। তা ছাড়া, আপনি বিছানায় শুয়ে মরার জন্যে অপেক্ষাও করছেন না।'

'বাইরে থেকে তা-ই মনে হয়। ভেতরে ভিন্ন চিত্র। আমার দেহে বিচিত্র রোগ বাসা বেঁধেছে। এই অসুখের নাম সিস্টেমিক ক্লেরোসিস। আমার হাত আর মুখের অবস্থা দেখেছেন? কুষ্ঠ রোগীর সব লক্ষণ ওখানে আছে। চামড়া শুকিয়ে শক্ত হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। চামড়ার রঙ হয়েছে শ্বেতী রোগীদের মত। কিছুদিন পর ঠোঁট, নাকের পাটা, চোখের পাতা, কানের লতি সব বিলীন হয়ে যাবে। ঠেকানোর কোনও রাস্তা নেই। এ এক ভয়াবহ রোগ। এ

রোগে শরীরের ইমিউন সিস্টেম দেহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করার বদলে শরীরকেই আক্রমণ করে বসে। কুষ্ঠের চিকিৎসা আছে, কিন্তু এর নেই। বাইরে যেমন দেখছেন, ভেতরে হার্ট এবং লাঙের অবস্থাও অমনই। ইউরোপ-আমেরিকার বড়-বড় সব ডাক্তার দেখে জবাব দিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এবং সেটা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। ছ'মাস আগে দেশে এসেছি শেষ চেষ্টাটা করার জন্যে।'

'শেষ চেষ্টাটা কি অন্যের কাছ থেকে আয়ু নেয়া?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'কিন্তু এত দেশ থাকতে এখানে কেন?'

'টাকা ছড়ালে এখানে সব করা সম্ভব। তা ছাড়া, কাজটা আমি করতে চাচ্ছি ভারতীয় দেবীর সহায়তায়। কৃষ্ণ-জাদুর চর্চা করে কোনও দেবীকে একবার ডেকে আনলে তাঁকে আর দ্বিতীয়বার ডাকা ঠিক না। সাড়া না-ও দিতে পারেন। আর যদি দেনও, জীবন সংশয় হতে পারে।'

'অসুখটা বাধালেন কী করে?'

'সিরাসের সঙ্গে পুরনো সব দেব-দেবীর মূর্তির খোঁজে দুনিয়ার নানান জায়গায় যেতে হয়েছে। ঘুরতে হয়েছে লোকালয় থেকে বহুদূরে সমাধি চত্বরে আর মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে। আমরা একবার গেলাম লিবিয়ার গাদামিসে। মেডিটেরিনিয়ানের কাছেই তিউনিসিয়া-আলজেরিয়া বর্ডারে। সিরাসের কাছে পাকা খবর ছিল ওখানে অ্যানুবিসের এক প্রাচীন মন্দিরে সাইমন মেগাসের লেখা অমূল্য পার্চমেন্ট আছে। এই সাইমন মেগাস যিশু খ্রিস্টের আমলে ইজরাইলের সব থেকে বড় জাদুকর ছিল। সামারিয়া এলাকার সব লোককে কালো জাদুর প্রভাবে বশীভূত করে রেখেছিল এই সাইমন। ঊষর মরুভূমির ভেতর গাদামিস এক অদ্ভুত শহর। বাড়ি-ঘর, মন্দির, রাস্তা-ঘাট সব মাটির নিচে। হাজার-হাজার বছর ধরে তিল-তিল করে লক্ষ-লক্ষ লোক গড়ে তুলেছিল ওই নগরী। অ্যানুবিসের মন্দির খুঁজে বার করে আমরা যতদিনে ঢুকলাম, ততদিনে পার্চমেন্ট হাওয়া। মন্দিরের গর্ভগৃহে অ্যানুবিসের ইয়া বড় মূর্তি। মূর্তির পায়ের নিচে গোল-গোল অনেকগুলো খোপ। বোঝাই যাচ্ছে ওগুলোতে পার্চমেন্ট স্ক্রোল

রাখা হত। কী মনে হলো, একটা খোপে হঠাৎ করেই হাত ঢুকিয়ে দিলাম। ভেতরে ধুলো-বালি, মাকড়সার ঝুল। আর কিছুই নেই। হাত বের করে আনছি, এমন সময় টের পেলাম কুট করে কীসে যেন কামড়ে দিল। হাত বাইরে আলোয় এনে দেখি কালো কুচকুচে পিঠঅলা বিটল বসে আছে তালুর ওপর। মাথায় ত্রিশূলের মত শিং। দু'দিকে দুটো দাঁড়া। দাঁড়ার শেষ প্রান্তে মানুষের আঙুলের মত আঙুল। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন সিরাস। বুঝলাম ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসেন সিরাস। পরদিনই আমেরিকায় ফিরে যাই আমরা। সিরাস আমাকে জানান, ওই বিটলগুলোকে বলা হয় মেগাসোমা অ্যানুবিস। অতি বিরল প্রজাতির বিটল। ওগুলো কাউকে কামড়ালে মৃত্যু অনিবার্য। ধরা হয় দেবতা অ্যানুবিসের অভিশাপ পড়েছে তার ওপর। এরপর কেটে গেছে দুই বছর। সিরাস মারা গেলেন। আমি পড়লাম অসুখে। ব্ল্যাক আর্টের চর্চা অনেক কিছু দেয় ঠিকই, তবে বিনিময়ে কেড়ে নেয় জীবনটাকেই!'

'আপনার সব কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে মাত্র দুই লাখ টাকার বিনিময়ে আপনি আমার আয়ু থেকে দশ বছর নিয়ে নেবেন, তাই তো? টাকাটা পাব কখন?'

'প্রস্তাবে রাজি হলে দুই লাখ টাকা এখনই পাবেন। কাজ শেষ হলে আরও আট লাখ। মোট দশ লাখ নগদ। তবে সাবধানের মার নেই। আপনার জীবন বীমা করিয়ে রাখতে চাই। যদি কোনও কারণে দ্রুত মারা যান, তা হলে আপনার নমিনি পাবে আরও দশ লাখ। পলিসি কেনা হয়ে গেছে। আমার হাতে যে ফর্মগুলো দেখছেন, ওগুলোতে যদি সই করেন, তা হলে আজই অ্যালিকোয় পলিসি খোলা হয়ে যাবে। এখন বলেন, আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন কি না।'

'আমি রাজি। কী করতে হবে বলেন।'

'আজ ডিসেম্বরের তেরো তারিখ। আপনাকে সাত দিনের ছুটি দেয়া হবে। এর ভেতর যদি ইচ্ছে হয় বাড়ি যেতে পারেন। তবে অন্য একটি কাজ আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। সেটি হলো সুনামগঞ্জের টাঙুয়ার হাওড়ে যাওয়া। হাওড় পার হলে পুব দিকে ভারত

সীমান্ত। মাত্র তিন শ' গজের একফালি সমতল জমি বাংলাদেশকে ভারত থেকে আলাদা করেছে। ওই জায়গাটাতে ওপারের পাহাড় থেকে খাসিয়া মেয়েরা পিঠে খড়ির বোঝা এনে বিক্রি করে। হাওড় অঞ্চলে গাছ নেই। এই খড়ি জ্বেলেই রান্নাবান্না করে ওখানকার লোকেরা। খাসিয়া মেয়েরা খড়ি বেচে যে টাকা পায়, তা দিয়ে ওখান থেকে বাজার-সদাই করে আবারও ফিরে যায় তাদের পাহাড়ি গ্রামে। এই খাসিয়া মেয়েগুলোর মাধ্যমে এক বিশেষ জাতের ধান সংগ্রহ করবেন। এই ধানের নাম ডুমাহি। ধরা হয় এটাই পৃথিবীর প্রথম ধান। উৎপত্তিও ওই হাওড় অঞ্চলেই। কম করে হলেও দশ হাজার বছরের পুরনো এই ধান। তুলনাহীন এর স্বাদ। ছিন্ন-মস্তা অহম উপজাতীয়দের দেবী। হাজার হাজার বছর আগে প্রথম যখন এই দেবীর উদ্ভব হয়, তখন এই ধানের অর্ঘ্য দিয়েই তাকে তুষ্ট করত পূজারীরা। টাকা যা চায়, দেবেন। খাসিয়ারা সৎ। উল্টো-পাল্টা ধান গছিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা কম। তবে ডুমাহি পাওয়া কঠিন।'

'এই ধান দিয়ে কী হবে? তা ছাড়া, এই ধান তো কাছে-পিঠেও কোথাও পাওয়া যেতে পারে। অতদূর যেতে হবে কেন?'

'এই ধানের ফলন অত্যন্ত কম। গাছে থাকা অবস্থাতেই ঝরে যায় বেশির ভাগ। ওই ধান এখন আর খাওয়ার জন্যে চাষ করা হয় না। এর চাষ হয় শুধুমাত্র পুজোয় ব্যবহার করার জন্যে। আর ওই কাজটা কেবল খাসিয়ারাই করে। ধান দিয়ে কী হবে, সেটা পরে জানবেন। মন্দাকিনীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে রওনা হয়ে যান। যাওয়ার আগে ফর্মগুলো সই করে ওর হাতে দিয়ে যাবেন। আর একটা কথা, একুশে ডিসেম্বর বিকেলে আপনাকে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে। রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হলে সব চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে চলে যাবে আপনার চাকরিটাও। আর যা-ই করেন, ধান আনতে ভুলবেন না।'

অফিস থেকে বেরিয়ে রিকশা নিয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পৌঁছাল অমল। তারপর লোকাল বাস ধরে গাবতলী। পাটুরিয়ায় নিজ গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল। মানিকগঞ্জ থেকে বড়

ইলিশ মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি, মা-বোনের জন্যে কাপড়, ছোট দুই ভাইয়ের জন্যে বাটার জুতো-স্যাণ্ডেল এইসব কিনে হুলস্থুল করেছে। বাসে আসতে আসতে ভেবে দেখেছে অমল। দুই লাখ টাকা অনেক টাকা। বহু সমস্যার সমাধান এই টাকায় হবে। আদৌ যদি আর অফিসে ফিরে না যায় সে, তা হলেও খুব বেশি ক্ষতি হবে না। যদিও আয়ু বিক্রির বিষয়টা একেবারেই হাস্যকর। গেলেও ক্ষতি নেই। তারপরেও কী দরকার এসব ঝামেলার? মৃণাল বাবু মরলেই কী আর বাঁচলেই কী?

নয়

পরদিন সকালে ইলিশ মাছ ভাজি আর মসুরির ডাল ঘাঁটা দিয়ে গরম ভাত খেয়ে বিমলকে সঙ্গে নিয়ে মানিকগঞ্জ কোর্টে গেল অমল। দেখা করল তার বাবার পরিচিত উকিল অপূর্ব কুমার নন্দীর সঙ্গে। কেসের নোটিশ, কাগজপত্র সব দেখে অপূর্ব বাবু বললেন, 'শোনো, অমল, তোমার জ্যাঠা শৈলেনকে আমি চিনি। কেস-কাচারি করে করে পেকে ঝুনো হয়ে গেছে। এর সঙ্গে পাল্লা দেয়া খুব কঠিন। এই মামলা যদি জিততেও পারো, তবুও দেখবে কেস চালাতে গিয়ে ভিটে-মাটি বিক্রি করতে হয়েছে। আমি বলি কী, কিছু টাকা-পয়সা ওর হাতে দিয়ে মিটমাট করে নাও। ওকে বলো, কেসটা তুলে নিয়ে জমি-বাড়ি তোমাদের নামে লিখে দিতে। আজ বাড়ি ফিরে যাও। ভেবেচিন্তে দেখো। যদি মামলা লড়তেই চাও, তা হলে কাল এসো। তখন দেখব।'

বাড়ি ফিরে বিকেলের দিকে মাকে নিয়ে জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করল অমল। জ্যাঠা কেস উঠিয়ে নিতে রাজি। জমিও লিখে দেবে, তবে তার জন্যে নগদ চার লাখ দিতে হবে। পরিবারের ভেতরে বলেই এত কম! বাইরের লোক হলে দশ লাখের নিচে হত না। রাতে বিছানায় শুয়ে পরদিন কীভাবে সুনামগঞ্জ যাবে, অমল ভাবতে লাগল সেই কথা।

দশ

বাসে করে সিলেট শহরে পৌঁছতেই রাত হয়ে গেল। দরগা গেটের এক হোটেলে উঠল অমল। সুনামগঞ্জের বাস ছাড়ে আম্বরখানা নামের এক

জায়গা থেকে। হোটেল থেকে ওয়াকিং ডিসট্যান্স। ঝরঝরা লোকাল বাসে চড়ে সুনামগঞ্জে গিয়ে যখন উঠল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। মৃণাল বাবু যে জায়গার কথা বলেছিল, তা তখনও চল্লিশ মাইল দূরে। ওই জায়গার নাম ট্যাকের ঘাট। বর্ষাকালে যাওয়া সহজ। হাওড় পাড়ি দিয়ে লঞ্চে কিংবা ইঞ্জিন লাগানো নৌকোয় হাওয়া খেতে-খেতে ওপারে গেলেই হলো। যত সমস্যা শুকনোর সময়। হাওড় শুকিয়ে কাদা। মাঝে-মধ্যে আবার গভীর জলাশয়। হেঁটে-সাঁতরে যদিও বা যাওয়া যায়, তবে ওপারে পৌঁছতে কত সময় লাগবে, ভগবান জানেন। হাওড়ের রুট বাদ দিলে বিকল্প পথ হলো ভারতীয় বর্ডারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষা সরু রাস্তা। রাস্তা না বলে ট্রেইল বলাই ভাল। ট্রেইল যেখানে চওড়া সেখানে রিক্সা-ভ্যান, টেম্পো চলে। বাকিটা হয় হাঁটো, না হয় সাইকেল চালাও।

ওবেলায় সেই জায়গায় যাওয়ার সাধারণ যানবাহন সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাতটা সুনামগঞ্জের ছারপোকা বোঝাই বেডঅলা বোর্ডিং-এ প্রায় নির্ঘুম কাটিয়ে সকালে ভটভটি টেম্পোয় চড়ে রওনা হলো অমল।

ঝাঁকি-ধুলো বাদ দিলেও টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় চোখে-নাকে জলের বান ডাকল। নানান তাল করতে-করতে ট্যাকের ঘাটে অমল যখন পৌঁছাল, তখন সূর্য পাটে বসেছে। খাসিয়া মেয়েরা খড়ি-লাকড়ি বেচে, বাজার-সদাই করে ফিরে গেছে যে যার বাড়িতে। তারা আবার আসবে পরদিন সকালে। রাস্তা ঘেঁষা বিশাল এক রেইনট্রি গাছের নিচে বসল অমল। পশ্চিমে টাঙ্গুয়ার হাওড়। উল্টো দিকে এক চিলতে জমির ওপর ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির পরিত্যক্ত কয়েকটা হাফ বিল্ডিং, জং-ধরা লোহার ট্রলি, ঘাস-গজানো রেলওয়ে ট্র্যাক, আদ্যিকালের মরচে-পড়া ইয়া বড়-বড় সব ক্রেন, স্বচ্ছ নীল জলের ছোট্ট একটা সরোবর। সমতল জমিনটার পরেই আদিগন্তবিস্তৃত ঘন গাছপালা ঢাকা আকাশছোঁয়া পাহাড়ের সারিতে পড়ন্ত বিকেলের সোনালি আলো। ছবির মত সুন্দর জায়গাটা দারুণ রকম নীরব। চারদিকে কী যেন নেই ভাব। জীবন আর সময় দুটোই থমকে গেছে এখানে।

এ যেন ইহজাগতিক ব্ল্যাক-হোল। অনন্তকাল ধরে সব কিছু একই রকম। সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কম্পাউণ্ডের পরেই ঘাসে ঢাকা বিশাল এক খালি মাঠ। মাঠ পেরিয়ে ছোট মহল্লায় একতলা-দোতলা টিনের বাড়ি। মহল্লার ওপারে বাজার, মসজিদ। কিছুক্ষণ বসে থেকে বাজারের দিকে রওনা হলো অমল।

হোটেল-বোর্ডিং এখানে নেই। রাতটা কোথায় কাটাবে বুঝতে পারছে না। বাজারটা ছোট হলেও ভাল। ছোটখাট রেস্তোরাঁ, চায়ের স্টল, মনোহারি দোকান, এমন কী ইলেকট্রনিক আইটেম সারাইয়ের দোকানও আছে। সম্ভবত খাসিয়াদের জন্যেই এসবের আয়োজন। রেস্টুরেন্টে খেয়েদেয়ে রাতে কোথায় থাকা যায় মালিকের কাছে সেই কথা পাড়ল অমল। মসজিদের মোয়াজ্জিনের ঘরে থাকার ব্যবস্থা হলো। সে জাতে হিন্দু হলেও সমস্যা নেই। মেহমান বলে কথা। তবে ট্যাকের ঘাটে আসার উদ্দেশ্য গোপন রেখে জানাল, এমনিই বেড়ানোর জন্যে এসেছে। পরদিন মসজিদের পুকুরে স্নান করে নাস্তা সেরে আবারও রেইনট্রি গাছটার নিচে গিয়ে বসল অমল। এখন খাসিয়া মেয়েরা কখন আসে, সেই অপেক্ষা। এগারোটা বেজে গেল, খাসিয়াদের দেখা নেই। এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। বাজারে ফিরে গিয়ে খাসিয়া মেয়েরা কখন আসবে সেইটে জিজ্ঞেস করা সম্ভব না। উল্টো-পাল্টা ভেবে বসতে পারে। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল অমল। আর ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ের ট্রেইল বেয়ে পিলপিল করে নেমে আসছে একদল খাসিয়া মেয়ে। পিঠে খড়ির বোঝা। মেয়েগুলো সোজা এসে থামল রেইনট্রি গাছটার নিচে। লাকড়ির বোঝা নামিয়ে জিরোতে বসল। তাদের ফর্সা ধবধবে গালে লাল রঙের ছোপ, কপালে মেরুন টিপ। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল অমল। মাঝবয়সী তিনজন মহিলার সব খড়ি কিনে ফেলল। দর-দামের ধারই ধারল না। এরপর পাড়ল আসল কথা। সর্দারনী টাইপ একজনের হাতে পাঁচ শ' টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল এক কেজি ডুমাহি ধান এনে দিতে। এবং সেটা আজকের মধ্যেই। মহিলা জানাল আজ আর হবে না। ওখান থেকে তার বাড়ি আধা

বেলার রাস্তা। তা ছাড়া, বর্ডার দিনে একবারই পার হওয়া যায়। পরদিন সকালে এনে দেবে।

পর-পর দু'রাত মোয়াজ্জিনের ঘরে থাকা সম্ভব না। মহাযন্ত্রণা হলো দেখছি, মনে-মনে ভাবল অমল। কিন্তু কী আর করা? গাছতলায় শুতে হলেও আরও একটা রাত এখানে তাকে কাটাতে হবে। গাছতলায় শুতে সমস্যা নেই, সমস্যা হলো লোকে সন্দেহ করতে পারে। নানান প্রশ্ন করবে তারা। ফেরারি আসামি ভেবে পুলিশে খবর দেয়াও বিচিত্র না। অমল মহিলাকে জানাল, ধান হাতে পাওয়ার পর আরও পাঁচ শ' টাকা বকশিশ দেয়া হবে। তবে সকাল সকাল এনে দিতে হবে। কথাবার্তা সেরে বাজারের দিকে হাঁটা ধরল অমল। এমন সময় পেছন থেকে মহিলাদের ডাক শুনে থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। মহিলারা জানতে চাচ্ছে, খড়ির বোঝা কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে। ধানের টেনশনে খড়ির কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে। অমল জানাল আপাতত খড়িগুলো ওখানেই থাক। পরে উঠিয়ে নেবে। আগের রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে অমল জানাল, তার শরীরটা ভাল না। বিছানায় শুয়ে একটু রেস্ট নিতে চায় সে। আবারও মোয়াজ্জিনের ঘর। রাতে কিছু খেল না অমল। বলল, পেট খারাপ। কোনও মতে রাতটা যাতে পার হয়, ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা। পরদিন সকালে মোয়াজ্জিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে আবার গাছতলা। রাতে হাওয়া হয়ে গেছে খড়ির বোঝাগুলো। খাসিয়া সর্দারনী ধান নিয়ে এলেই হয় এখন।

বেলা চড়ে গেল, খাসিয়া মেয়েরা আসছে-যাচ্ছে, অথচ সর্দারনীর দেখা নেই। সুনামগঞ্জ ফিরতে হলে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে। এরপর অতদূরের রাস্তায় কেউ আর যেতে চাইবে না। অধৈর্য হয়ে পায়চারী শুরু করল অমল। কী সিদ্ধান্ত নেবে ভেবে পাচ্ছে না। খাসিয়া মেয়েদের কাউকে যে জিজ্ঞেস করবে, সেটাও সম্ভব নয়। কাল যে মেয়েগুলো এসেছিল, আজ তাদের কেউ আসেনি। সর্দারনীর নাম পর্যন্ত জানে না সে। একটাই রাস্তা খোলা আছে, সেটা হলো আজ সুনামগঞ্জ গিয়ে রাতটা কাটিয়ে কাল আবার এখানে ফিরে আসা। কিন্তু ফিরে আসতে গেলেও দিন পার হয়ে যাবে। এর ভেতর সর্দারনী

এসে তাকে না পেয়ে ফিরে গেলে আর হয়তো দেখাই হবে না। হলেও সেটা হবে একুশ তারিখের পর। তখন আর কী হবে ওই ধান দিয়ে? গাছতলায় বসে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল অমল। ভোঁ-ভোঁ করছে মাথার ভেতর। মনে হচ্ছে শূন্য হয়ে গেছে করোটি। কতক্ষণ এরকম সমাধিস্থ অবস্থায় কেটে গেছে বলতে পারবে না অমল। তার সংবিৎ ফিরল 'হেই, বাবু!' ডাক শুনে। চোখ তুলে দেখল, তার সামনে দাঁড়ানো সর্দারনী, হাতে পুরানো কাপড়ের ছোট একটা পোঁটলা। সর্দারনী জানাল এক কেজি পাওয়া যায়নি, অনেক খুঁজে মাত্র আধ কেজি জোগাড় করতে পেরেছে সে। মহিলার হাতে পাঁচ শ' টাকার দুটো নোট ধরিয়ে দিয়ে টেম্পো ধরতে ছুটল অমল। শুনতে পেল পেছন থেকে মহিলা চেঁচাচ্ছে একটা নোট বেশি হয়ে গেছে, ফেরত নিয়ে যান। ছুটতে ছুটতেই অমল বলল, 'রেখে দাও, মিষ্টি কিনে খেয়ো।'

ধান-টান নিয়ে অমল যখন ধানমণ্ডি এসে পৌঁছাল, তখন একুশ তারিখ বিকেল চারটা। ডেডলাইন রাইফেলের গুলি হলে বলা যেত সময়সীমা কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এগারো

মৃণাল বাবুর সঙ্গে হলঘরে দেখা হলো অমলের। সরাসরি ধানের পোঁটলাটা তার সামনে টেবিলের ওপর রেখে বলল অমল, 'এই হলো আপনার ডুমাহি ধান। দেখে নিন ঠিক আছে কি না।'

'আপনি ডেলিভারি নেয়ার সময় খুলে দেখেননি?'

'না, দেখিনি। সময় ছিল না।'

পোঁটলাটা খুলে একটা মাত্র ধান দু'আঙুলে তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল মৃণাল বাবু। আকারে বেশ ছোট এবং গোল ধরনের ধান, গায়ে ঝকঝকে সোনালি আর গাঢ় খয়েরি ডোরাকাটা। ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। এটাই ডুমাহি ধান। আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে নিন। রাত বারোটায় ফের দেখা হবে। মন্দাকিনী, ওকে ওর ঘর দেখিয়ে দাও।'

'স্যর, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।'

'কী প্রশ্ন, অমল বাবু?'

'এই ধান তো আগেও জোগাড় করা যেত। আমাকে দিয়ে এত তাড়াহুড়ো করে এটা নিয়ে আসার কারণ কী?'

'যে কাজটা আমি করতে চাই, সেটার পুরো প্রক্রিয়াতে কিছুটা হলেও আপনার অবদান থাকতে হবে। আপনি যে স্বেচ্ছায় আপনার আয়ু দিতে চাচ্ছেন, সেইটে হতে হবে প্রমাণিত সত্য। আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন, এখন যান। ঘুমিয়ে ফ্রেশ হন। সারারাত জাগতে হবে।'

বারো

রাত এগারোটার সময় অমলকে ঘুম থেকে ওঠাল মন্দাকিনী। তাকে বাথরুমে নিয়ে মাথার সব চুল কেটে ন্যাড়া করে দিল। ওয়ান টাইম রেজর চালিয়ে চেঁছে দিল বগলের নিচ। তারপর অমলের হাতে ছোট কেঁচি ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে যত অনাকাঙ্ক্ষিত কেশ আছে, সব সাফ করে সাবান মেখে স্নান সেরে ফেলেন। বাথরুমে সাদা থান কাপড় রাখা আছে। স্নানের পর ওটা পরবেন। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। হলঘরে মৃণাল বাবু অপেক্ষা করছেন। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

মনে-মনে বিরক্ত হলো অমল। বলল, 'লক্ষ করেছি, আসার পর থেকেই আপনি আশপাশে ঘুরঘুর করছেন। আমাকে একা থাকতেই দেয়া হচ্ছে না। বিষয় কী জানতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। আজকের রাতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাতে আপনাকে নিয়ে সাধনায় বসবেন মৃণাল বাবু। বেশ কিছু নিয়ম-কানুন মেনে তারপর সাধনায় বসতে হয়। নিজের অজান্তে আপনি উল্টো-পাল্টা কিছু করে বসলে সাধনা পণ্ড হতে পারে। শেষ মুহূর্তে এসে এই ঝুঁকি নেয়া যাবে না। বোঝা গেছে?'

বাথরুম থেকে বেরনোর পর অমলকে

হলঘরে মৃণাল বাবুর কাছে নিয়ে গেল মন্দাকিনী। অমল লক্ষ করল, আমূল বদলে গেছে হলঘরটা। বিরাট ফাঁকা ঘরটাতে ছয়টা মাটির পিদিমের হালকা আলোয় শুধু আয়তাকার নিচু মতন একটা বেদী চোখে পড়ল। বেদীর ওপর আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ছিন্ন-মস্তার কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের অপার্থিব মূর্তি। অনেক উঁচুতে কাঁচের পাল্লা বসানো ছাতের বেশ কিছু পাল্লা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অমলের চোখে পড়ল কালো আকাশের পটভূমিতে নক্ষত্রের মিটিমিটি। মূর্তির সামনে সাদা-কালো মার্বেল মেঝের ওপর বিরাট সবুজ রঙের বারোটা পাপড়িঅলা পদ্মের মাঝখানে লাল ত্রিভুজের ভেতর সাদা হেক্সাগ্রাম আঁকা। পদ্মের বারোটা পাপড়ির ছয়টির মাথার কোণগুলোর ভেতর পাকা কলা, নারকোল, আখের টুকরো, জবা, পদ্ম ও ধুতুরা ফুল রাখা। বাকি ছয়টিতে সোনা, রূপা, লোহা, তামা, দস্তা এবং পারদ। ছয়টি দুষ্প্রাপ্য ও সহজলভ্য ভিন্ন-ভিন্ন ধাতু। ত্রিভুজের তিন কোণ ভর্তি খই। বোঝাই যাচ্ছে, ওগুলো ডুমাহি ধানের। হেক্সাগ্রামের ছয় কোণের মাথার কোণটা ছিন্ন-মস্তার মূর্তির দিকে তীরের মত সোজা করে আঁকা। কোণটা খালি। উল্টোদিকের কোণটারও একই অবস্থা। ডানে-বাঁয়ে দুটো-দুটো চারটে কোণে চারটে কাঁচের খুরি। খুরিগুলোর তিনটিতে মাটি, জল, জ্বলন্ত অঙ্গার; চার নম্বর খুরির মুখ কাঁচের ঢাকনা দিয়ে আটকানো। ভেতরে কিছু নেই। সবুজ রঙের পদ্মফুলটাকে ঘিরে সাদা কালিতে লেখা: 'পস্তিফিক্স ইস্তেরিস নুমেআর্তেম আউদিঅরাশিওনেম মিয়ামেত সেকুন্দুম ইম্পেরিয়ুম।'

এতকিছু দেখতে অমলের সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তার দিকে এগিয়ে এল মৃণাল বাবু। তাঁর পরনেও সাদা থান, মাথাতে কোনও

ল নেই। সম্ভবত অসুখই দফা শেষ করেছে ওগুলোর।

'অমল বাবু, আপনি রেডি তো?'

'আজ্ঞে, আমি রেডি। কী করতে হবে বলেন।'

'বলব, তবে তার আগে কিছু কথা আপনার জানা দরকার। আয়ু বাড়ানোর জন্য ছিন্ন-মস্তাকে আহ্বান করব আমি। ইউরোপ-আমেরিকা হলে অন্য দেবীকে ডাকতে হত। যে দেশে যে দেবীর পুজো হয়, তাকে ডাকাই ভাল। তা ছাড়া, দেব-দেবীরা পূজারীর ডাকে সাধারণত মাত্র একবারই সাড়া দেন। সিরাস এবং আমি পশ্চিমা দেশের পরিচিত প্রায় সব দেবীকেই নৈবেদ্য দিয়েছি। এখন বাকি আছে শুধু ছিন্ন-মস্তা আর বগ্লামুখীর মত দেবীরাই।

'ছিন্ন-মস্তার সাধনার জন্যে দরকার হয় সঠিক তিথির। এই ব্রহ্মাণ্ডকে ঘিরে আছে অসংখ্য বলয় বা স্ফেয়ার। এমনই একটি বলয়ে বেশিরভাগ দেব-দেবীর অবস্থান। মাঝে-মাঝে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান এমন হয় যে, ওই বলয়টা পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে। দেব-দেবীরা আগ্রহ নিয়ে তাঁদের ভক্তদের দেখেন। এই সময়টাকেই বলা হয় মাহেন্দ্রক্ষণ। তখন কোনও দেবী কিংবা দেবতাকে ডাকলে তাঁরা ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। আজ শুক্রবার কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। প্রতি দু' শ' বছরে নব্বই ডিগ্রিতে সৌরজগতের সব গ্রহ এক লাইনে আসে। ত্রিশ ডিগ্রিতেও আসে এক লাইনে। তবে সেটা হয় প্রতি তেত্রিশ শ' বছরে একবার। খ্রিস্টের জন্মের ৫৮১ বছর আগে একবার হয়েছিল। হেকাটির মন্দির ওই বছরই তৈরি হয়। আমাদের ভাগ্য সাঙ্ঘাতিক ভাল, কারণ প্রতি দু' শ' বছরে যে ঘটনাটা ঘটার, সেটি ঘটছে এখনই। প্রতি বছর একুশে ডিসেম্বর পৃথিবী কর্কট নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছে চলে আসে। পৃথিবীর ডান দিকে থাকে কর্কট নক্ষত্র, বাঁ দিকে সূর্য আর মকর নক্ষত্র এবং উপরে কন্যা নক্ষত্রমণ্ডলী। আজ রাতে পৃথিবী সহ সৌরজগতের সব গ্রহ মিলে ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হবে। আগেই বলেছি, ব্ল্যাক আর্ট প্র্যাকটিস শুরু হয়েছিল প্রাচীন ব্যাবিলনে, সুমেরীয় সভ্যতার সময়। ইতিহাস বলে, আধুনিক অ্যাস্ট্রোনমির জন্মও ওই সময়েই। আসলে ব্ল্যাক আর্ট

প্র্যাকটিশনাররাই অ্যাস্ট্রোনমির জনক। নক্ষত্র-তিথির জ্ঞান ব্ল্যাক আর্টের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কারণেই যুগে যুগে অতি শিক্ষিত আর জ্ঞানী লোকেরাই এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছে। জাদুকর মার্লিন, গ্যালিলিও, গিওর্দানো ব্রুনো, আইজ্যাক নিউটন, ইয়োহ্যানেস কেপলার এঁদের কথা ভেবে দেখেন। এঁরা সবাই জগদ্বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোনমার, অথচ তাদের বিরুদ্ধে ব্ল্যাক আর্ট চর্চার অভিযোগ আছে! সে যা হোক, এত কথা বলছি শুধু আজ রাতের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে। হেক্সাগ্রামের চার কোণে ব্রহ্মাণ্ডের চারটি মৌলিক উপাদান রাখা হয়েছেঃ মাটি, আগুন, জল আর হাওয়া। উপরের কোণটাতে বসব আমি। সব থেকে নিচের কোণটাতে বসবেন আপনি। ছিন্ন-মস্তা একই সঙ্গে উর্বরতা এবং মৃত্যুর দেবী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিরল নক্ষত্র-তিথি মেনে সঠিক উপাচার সাজিয়ে যেভাবে সাধনায় বসতে যাচ্ছি, তাতে করে দেবী আমার ডাকে সাড়া দেবেন। তবে দেবী এলেও নিজ রূপে আসবেন না। উনি নেমে আসবেন মহা ডামরী-র রূপ ধরে। অতি ভয়ঙ্কর রূপ এই মহা ডামরীর। তাঁকে নেমে আসতে দেখে আতঙ্কে মূর্ছা যায়নি এমন সাধক নেই বললেই চলে। অনেকে তাঁর রূপ দেখে ভয়ে মারাও গেছে। আপনাকে একটা মন্ত্র মুখস্থ করাব। আপনাকে যেখানটায় বসাব, সেখানে বসে মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ রেখে ওই মন্ত্রটা পড়বেন। যা-ই ঘটুক না কেন, চোখ খুলবেন না কোনও মতেই। এত কিছু বলছি, কারণ মহা ডামরী চাইবে আপনি তাঁকে দেখেন এবং সাধনা পণ্ড হোক। মন্ত্রটা শিখে নেনঃ "দিসেম আনোস দিয়াদমিনিমেই"। আমার সব মন্ত্রই ল্যাটিন, সিরাসের কাছ থেকে শেখা। অন্য মন্ত্র জানা নেই। সিরাস বলত, মানুষের সব ভাষা দেব-দেবীদের জানা। প্রয়োজন শুধু সঠিক মন্ত্র ও উচ্চারণ। মন্দাকিনী, তুমি এখন যাও। ভোরে দেখা হবে। যাওয়ার আগে ছাগীটা এনে দাও।'

তেরো

রাত বারোটা তিন মিনিটে ছিন্ন-মস্তার মূর্তির সামনে একটা পোয়াতি ছাগী বলি দিল মৃণাল বাবু। মৃত ছাগীর পেট চিরে বের করল দুটো মরা বাচ্চা। বাচ্চাদুটোর বুক ফেড়ে হার্ট বের করে

ওগুলো থেকে দু'টুকরো মাংস কেটে এক টুকরো নিজে চিবিয়ে খেল, অন্য টুকরোটা খেতে দিল অমলকে। কাজ দেখে গা গুলিয়ে উঠল অমলের। কিন্তু না খেয়ে উপায় নেই। সে দেখল ভাঁটার মত ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে মৃণাল বাবুর চোখের তারা। এরপর মৃণাল বাবু দেবদুয়ার থেকে সংগ্রহ করা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিল অমলের টাকের ওপর। জলটা ভীষণ ঠাণ্ডা। অমলের মনে হলো তার মাথা চিরে হার্টে চলে গেছে ওই জল। মনে হলো বহুদূর থেকে কে যেন বলছে, এ এক ধরনের মার্কিং, দেবী যেন আপনাকে চিনতে পারেন। গলা শুনে তার মনে হলো, মৃণাল বাবু না, কথা বলছে মহাশ্মশান থেকে উঠে আসা কোনও প্রেত। এরপর মৃণাল বাবু বসল হেক্সাগ্রামের মাথার কোণটার ভেতর, অমলকে বসাল নিচের কোণটাতে। কিছুক্ষণ পরেই ঘোর লাগা অবস্থায় অমল শুনতে পেল বিচিত্র ভাষার গুনগুন মন্ত্র উচ্চারণ। প্রথমে একটা কণ্ঠস্বর, তারপর অসংখ্য। যেন মৃণাল বাবুর সঙ্গে মন্ত্র পড়ছে অগুনতি প্রেতাত্মা। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল সেই ধ্বনি। মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে, ভেঙে-চুরে উড়ে যাবে ঘরের দেয়াল, জানালা-দরজা। ঘেমে নেয়ে যেতে লাগল অমল। হঠাৎ করেই কমতে লাগল ঘরের তাপমাত্রা। সেই সঙ্গে বদলে গেল অযুত কণ্ঠের উচ্চারণ করা ধ্বনিও। এবার অমল শুনতে পেল সম্মিলিত বিলাপের সুর। হিম এমন বাড়ল যে অমলের মনে হলো শরীরের প্রতিটি রক্তকণা জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের ভেতর চোখের সামনে ভেসে উঠল জীবনের সমস্ত ঘটনা। ঠিক তার পরেই দপ করে নিভে গেল সব কিছু।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে অমল দেখল সে বিছানায় শুয়ে আছে। পাশে চেয়ারে বসা স্যুট-কোট পরা মৃণাল বাবু। বাবু বলল, 'অমল বাবু, আমি আর মন্দাকিনী আজই দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি। আর হয়তো কখনও দেখা হবে না। এই ছোট ব্যাগটা রাখেন। এর ভেতর নগদ আট লাখ টাকা আছে। সেই সঙ্গে একটা এনভেলপও পাবেন। আপনার জীবন বীমা পলিসির কাগজ আছে ওটাতে। সাবধানের মার নেই ভেবে আপনার মাথার তালুতে আমার শরীরের রক্ত দিয়ে স্বস্তিকা এঁকে দিয়েছি। এই রক্তের সঙ্গে মাখানো হয়েছে

আসামের গোহাটির যে মন্দিরে ছিন্ন-মস্তার মূর্তি আছে, সেই প্রতিমার পায়ের তলার মাটি। যে তিথিতে পুজো দিয়েছি, তা আজ রাত বারোটায় শেষ হবে। দৈব-শক্তির প্রভাব থাকবে সেই সময় পর্যন্ত। এর ভেতর তালুর এই চিহ্নটা মোছা যাবে না। যদি মুছে ফেলেন, তা হলে পুরো আয়ুই হারিয়ে ফেলতে পারেন। সুতরাং খুব সাবধান। একটা বেস বল ক্যাপ দিচ্ছি। মাথায় পরেন। আশা করি কোনও সমস্যা হবে না। কাগজপত্র এবং লাগেজের ফর্মালিটি সারতে মন্দাকিনী আগেই এয়ারপোর্টে চলে গেছে। আমি আপনার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় রয়ে গেছি। গুড লাক অ্যাণ্ড থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং।'

মৃণাল বাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে স্কুটার নিয়ে মেসে ফিরল অমল। রুমে ব্যাগ-ছ্যাগ রেখে শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সময় কাটছে না কিছুতেই। ভাবল পীর ইয়ামেনী মাজারের কাছে পার্কটায় যাওয়া যায়। রেখার সঙ্গে দেখা হলে ভাল সময় কাটবে। দশটার দিকে পার্কে এসে দেখল পার্ক একেবারে ফাঁকা। আগের মতই গুলিস্তান মোড়ে ছোটাছুটি করছে লোকেরা। প্রতিদিন একই দৃশ্য। অনন্তকাল ধরে চলছে। বেঞ্চের ওপর বসে এসব দেখতে দেখতে ঘুমে জড়িয়ে এল তার চোখ।

অমলের ঘুম ভাঙল খিকখিক হাসি আর চটর-পটর আওয়াজ শুনে। চোখ মেলে তাকাতেই আকাশের গায়ে কামালের দাঁত বের করা মুখ দেখতে পেল অমল। বেঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়ে কামাল তার মাথা মালিশ করে দিচ্ছে। কামাল বলল, 'স্যর, মাথা টাক করছেন ক্যান? আবার টুপিও পিনছেন! মাথার থন টুপি খুইল্যা পড়ছে মাটিত। আমি না আইলে চুরে নিতো গিয়া। মাথা ভর্তি ধুলা-বালি আর লাল রঙ। বিয়া-বাইত্যে গেছিলেন মনে লয়। ফাজিল পুলাপান আর মাইয়ালোকের কাণ্ড। সব সাফ কইরা দিছি। সহজে উঠবার চায় না। "নভরত্ন" তেল মাখান লাগছে। মাথাও বানাইছি। আপনি দেহি জন্মের ঘুম ঘুমাইছেন। এত মালিশ দিতাছি, হের পরেও ঘুম ভাঙ্গে না!'

অমল দেখল কামালের মুখটা ঝাপসা হতে-হতে একেবারে সাদা হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। ঠিক তার পরেই ঘনিয়ে এল আঁধার, দপ্ করে নিভে গেল সব আলো!